নবান্ন

(ছোট গল্প)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা
১০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে
শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়া অনেক সময় অপরাহ্ন ভোজন করিতে হয়, কিন্তু নিমন্ত্রণটা চিরদিন মধ্যাহ্নভোজন বলিয়াই চলিয়া আসে না কি? পূজার সময় 'নবান্ন' একটু নূতন ঠেকে বটে, কিন্তু শরতে—আশ্বিনে, অনেকস্থলে নবান্ন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাই আজ 'নবান্ন' পরিবেশন অশোভন হইবে না, ভাবিয়া পাঠকসমাজে নবান্ন উপস্থিত করিতে সাহস পাইলাম।

কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে অকপট অন্তঃকরণে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি 'নবান্ন' প্রকাশের নিমিত্ত যে রূপ আগ্রহ, যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য স্নেহ-ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি কোন দিন বিস্মৃত হইব না এবং সে ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

'নবান্ন' পাঠকের মনোরঞ্জন করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

মহালয়া
আশ্বিন ১৩১৯
কলিকাতা

গ্রন্থকার

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

সূচী

—:·:—

নবান্ন।

পরিবেশন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অজিতকে আসিতে দেখিয়া মহিন বলিয়া উঠিল, "এত বিলম্ব হ'লো যে?"

"যে সুন্দর লাইন, পৌঁছিব যে সে আশা একপ্রকার ত্যাগ করেছিলুম।"

"রাস্তায় কোন কষ্ট হয়নি তো?"

"যদি 'না' বলি তো সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হয়, আর যদি বলি 'হাঁ' তবে তোমাকে কষ্ট দেওয়া হয়। ঢের ঢের পল্লীগ্রাম দেখেছি মহিন-দা, কিন্তু এমনটি দেখিনি।"

"চমৎকার নয়?"

"নয় আবার, নাগরদোলার মত উঁচু নীচু পথ, সীতাকে বনবাস দেবার মত নিবিড় জঙ্গল—ঘন ঘন বাঁশঝাড়, চমৎকার নয়? রাগ করো না মহিন-দা, তোমার দেশের নিন্দা করচি না—এ কেবল সত্যব্রত সমালোচক-দের মত সত্য ও কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে স্বরূপ বর্ণনা করছি মাত্র। কোথাও ত্রুটী হ'য়ে থাকে ধরিয়ে দাও।"

"বি, এ পাশ করিলে কি হবে, তোমার ছেলেমানুষিটা দেখ্‌ছি এখনও যায়নি ; তুমি আমাদের ক্লাসের যে বক্তা অজিত, তাই আছ।"

অজিত "বস্‌" বলিয়া দুই ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি চাপিল।

মহিন তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

অজিত মহিনের সহপাঠী। দুইজনে বহুদিন এক সঙ্গে এক মেসে কাটাইয়াছে। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় ও বন্ধুত্ব।

মহিনের বিবাহ উপলক্ষে যে বৎসর তাহার জনকজননী কলিকাতা আগমন করেন এবং বিবাহ ব্যবধানে যে কয়দিন তাঁহাদিগকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হয়, সেই কয়দিন মেসের হাজিরে খাতায় অজিতের নাম গোটেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অজিত মহিনের অংশীরূপে খুব শীঘ্র মাতৃস্নেহের ডিগ্রী পাইল, দখল হারাইবার আশঙ্কায় মেসে বড় একটা দর্শন দিল না।

মহিনের মা এই মাতৃস্নেহাভিলাষী ছেলেটিকে সোণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন, পরম প্রীতির সহিত তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার স্বর্গগতা জননীর জন্য অশ্রুজল মুছিতেন। অজিতের মাতৃভক্তিও পরিপূর্ণ মূর্ত্তিতে এই স্নেহপরায়ণা করুণাময়ী নারীর নিকট উচ্ছল হইয়া উঠিত।

অজিত বাড়ীর ভিতর গিয়াই মহিন-দা'র জননীকে প্রণাম করিল।

"এই যে বাবা অজিত এসেছিস্‌। দেরী দেখে ভাব্‌লুম তুই বুঝি আর তোর মহিন-দা'র ছেলের ভাতে আস্‌তে পারলিনি। আহা! রোদে মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে! বোস্‌ অজিত বোস্‌" বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একখানি পাখা লইয়া অজিতকে বাতাস করিতে বসিলেন।

মহিন বলিল "মা, অজিত কি আজ বাতাস খেয়ে থাক্‌বে ?"

অজিত বলিল—"মহিন-দা'র হিসাবে বাতাস একটা খাওয়ার জিনিস নয়। লোকে কত অর্থ ব্যয় ক'রে পশ্চিমে হাওয়া খেতে যায়, সে সংবাদটা রাখ কি ?"

"সে খবর রাখিলেও এ খবর রাখি যে, ভেককুল বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে।"

"দেখ্‌লে মা, মহিন-দা' আমাকে ব্যাং বল্লে—"

মহিনের জননী দুই বন্ধুর এই কৌতুক-কলহে মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, এবং অজিতের দিক লইয়া বলিলেন—"যাঁহারা বাতাস খেয়ে থাকেন, তাঁহারা সাধু।"

এই সময়ে মহিনের স্ত্রী একহস্তে একখানি রেকাবীতে প্রচুর পরিমাণে রসগোল্লা সন্দেশ সাজাইয়া এবং অপর হস্তে একখানি কার্পেটের আসন লইয়া সেই প্রকোষ্ঠে রাখিয়া গেলেন; তারপর এক গ্লাস জল ও এক ডিবা পানহস্তে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন এবং যথাস্থানে খাবারের রেকাবখানি ও পানের ডিবা রক্ষা করিয়া শাশুড়ীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

এই মৌন-নিমন্ত্রণের মধ্যে একটা মধুর আহ্বান ও আগ্রহ প্রকাশ পাইল।

মহিনের জননী বলিলেন—"বাবা অজিত, একটু জল খেয়ে নে, ভাত খেতে তিন প্রহর বেলা হবে এখন।"

অজিত উঠিয়া দেখিল সলজ্জ বৌদিদি জড়সড় অবস্থায় একটী কোণে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সে তখন ভূমিষ্ঠ হইয়া একটী প্রণাম করিল। বলিল—"বৌদিদি, খোকাকে না দেখালে জল খাব না, যার জন্য এত আয়োজন তারই সাক্ষাৎ নাই।"

বৌ-ঠাকরুণ তখন তাড়াতাড়ি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

মহিন বলিল—"দেরি ক'রো না অজিত, এখনি লোকজন আসতে আরম্ভ করবে, তখন আর খাওয়াদাওয়ার সময় থাক্‌বে না—তোমার উপর পরিবেশনের ভার পড়েছে।"

"কে সে পরম উপযুক্ত ব্যক্তি যিনি এমন সহজ কর্ম্মটি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে অন্ততঃ দুটো ধন্যবাদ না দিলে আমার নরকেও স্থান হবে না।"

এই সময়ে অলঙ্কার-ভার-নিপীড়িত, মেঘ ও রৌদ্রের মত হাসি-কান্না বিজড়িত শিশুটিকে তাহার জননী অজিতের সম্মুখে মেঝের উপর শয়ন করাইয়া দিল।

অজিত বলিল "মহিন-দা, সুন্দর ছেলে হয়েছে"—মহিনের মুখখানি আনন্দোল্লাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

মহিনের মা স্নেহভরে শিশুর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন; বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ কর বাবা, যেন বেঁচে থাকে।"

অজিত পকেট হইতে একগাছি ঢাকার কারুকার্য্যখচিত হার বাহির করিয়া শিশুটির কুসুম-কোমল কণ্ঠে পরাইয়া দিল। হারের সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র লকেট সংলগ্ন ছিল। তাহাতে মহিনের সহিত অজিতের একত্রে তোলা একখানি ফটোগ্রাফ্ সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অজিত দেশী কালাপেড়ে কাপড়খানি মালকোঁচা করিয়া পরিয়াছে। ডবলব্রেষ্ট কামিজে সংলগ্ন সোণার বোতামগুলি আলোকসম্পাতে ঝক্‌মক্ করিতেছে। ললাটের উপর অল্প অল্প স্বেদ সঞ্চিত হইয়াছে। কামিজের আস্তিন অনেকটা দূর পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া সে আজ রসোগোল্লার হাঁড়ি লইয়া ব্যস্ত। বেচারী এই ভোজনরণক্ষেত্রে সহস্রবাহু অর্জ্জুনের অভাবটা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল।

অজিতের উপর কেবল মিষ্টান্ন পরিবেশনের ভার সমর্পণ করা হইয়াছিল। অজিত শূন্য হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া আনিতে ভাঁড়ারে ছুটিল।

মিষ্টান্নের ভাঁড়ারী ছিল একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা। তাহার রংটি স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের মত—সুন্দর ক্ষুদ্র ললাটের উপর উরগশিশুর ন্যায় কুঞ্চিত অলকগুলি মৃদুতরঙ্গে লীলায়িত হইতেছে—মুখের উপর অতি ক্ষুদ্র একটী তিল—ভ্রূযুগল ভ্রমরকৃষ্ণ, নয়নদ্বয় পুলকচঞ্চল। অজিত ভাবিল এ কি রকম ব্যাপার; এত লোক থাকিতে এই মেয়েটির হাতে মিষ্টান্ন-ভাণ্ডার দেওয়া হইল কেন? উৎসব-আনন্দের মাঝখান হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এত রসগোল্লা সন্দেশের ভিতর বন্দী করা হইল কেন? একে ত কখনো দেখি নাই।

অজিত ধীরে ধীরে আসিয়া রসগোল্লাশূন্য, রসপূর্ণ পাত্রটি বালিকার হস্তে প্রদান করিল। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—"এবার কি দিব বলুন? সন্দেশ, না রসগোল্লা?"

পরিবেশন-অনভ্যস্ত অজিত ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল—"যা হোক একটা কিছু দাও।"

বালিকা অল্প হাসিয়া বলিল—"তা কি কখন হয়! সকলে যা' চাইছে আগে তাই নিয়ে যান, পরে সন্দেশ দিবেন।"

এই সময়ে একটী বালক একটী বালিকার হস্ত হইতে তাহার রসগোল্লাটি ডাকাতি করিয়া লইয়া পলাইল। মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিল; তাহার মাতা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বালকের কিছু করিতে না পারিয়া কন্যার পিঠে দুইটি কিল বসাইয়া বলিল, "বল্লুম পোড়াকপালীকে যে এইখানে বসে খা, তা'না দেশ মাথায় ক'রে বেড়াচ্চে—বেশ করেছে, কেড়ে নিয়েছে।"

"বা-রে—আমি বুঝি ঘুরে বেড়াচ্চি; ও ছেলেটা কোথা থেকে এসে নিয়ে গেল। আমার বুঝি দোষ হ'ল?"

রোরুদ্যমানা মেয়েটির হাতে বালিকা স্নেহভরে দুইটি রসগোল্লা প্রদান করিল।

অজিতের মনে পড়িয়া গেল তাহাকে রসগোল্লা লইয়া যাইতে হইবে। সে তখন রসগোল্লা লইয়া প্রস্থান করিল।

এবার যখন অজিত ফিরিয়া আসিল তখন সে একটু অন্যমনস্ক। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রসগোল্লার রসে তাহার ইস্ত্রীকরা কামিজ সিক্ত হইয়াছে; দুই হস্ত হইতে টপ্ টপ্ করিয়া রস পড়িতেছে। সে বলিল—"এবার সন্দেশ চাই।"

অজিতের মনে দুই একটি প্রশ্ন আপন হইতে উঠিতেছিল—সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিল—"এর কি এত দিন বিবাহ হয় নি?" তারপর নিজেই উত্তর করিল—"হোক ভাল, না হোক ভাল, সে সংবাদে আমার প্রয়োজন কি?"

মনও বলিল—"তুমি পরিবেশন করিতে আসিয়াছ, তোমার কেন

বাপু অত খোঁজ? খোঁজ নেওয়া যদি তোমার স্বভাব হয়, ত, জিজ্ঞাসা কর কতগুলি মিষ্টান্ন ভাঁড়ারে আছে! যেটা সঙ্গত!”

এই সময় বালিকা একটী বড় পাত্র হইতে একখানি ছোট চেঙ্গারীতে সন্দেশ তুলিয়া দিতেছিল। সেই অবকাশে প্রদীপেব অল্প আলোকে অজিত দেখিল বালিকার সীমন্তে সিন্দূরের দাগ নাই, তখনি তাহার নিজের দৃষ্টির উপর সন্দেহ হইল; কিন্তু সংশোধন করিবার মত সাহস কুলাইল না। বালিকা চেঙ্গারী আনিয়া দেখিল অজিতের সর্ব্বাঙ্গে রস—জামা কাপড়ে রস; কপাল হইতে স্বেদ নির্গত হইতেছে, মুখখানি মলিন হইয়াছে। বালিকা সহজভাবে বলিল—“আপনার বোধ হয় পরিবেশন করা অভ্যাস নাই? অত্যন্ত ঘেমেছেন যে; আপনি একটা তোয়ালে সঙ্গে রাখুন। এই নিন্। মুখটা মুছে ফেলুন।”

অজিত ইহাতে কোন উত্তর করিতে পারিল না। মনে মনে বলিল “মহিন-দা বেশ দেখে শুনে মিষ্টান্নের ভাঁড়ারী বেশ মিষ্ট লোকটিকেই করেছেন।” একবার ভাবিল মহিন-দাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এদের বাড়ী কোথা, মহিন-দা এদের কে হয়? না, না—তা হ’তেই পারে না, মহিন-দা কি মনে করিবে? আমারই বা আবশ্যক কি? এই সময় মহিনের স্ত্রী এক ডাবর পান ভাঁড়ারে রাখিয়া গেলেন। যাইবার সময় বালিকার কাণে কাণে মৃদুস্বরে বলিয়া গেলেন—“অজিতবাবুকে গোটা কয়েক পান দিও নির্ম্মল!”

বালিকা বলিল—“এই নিন পান।” অজিত মহা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। তখন সে সন্দেশের পাত্রটি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়াছে—কেমন করিয়া পান গ্রহণ করিবে ভাবিয়া পাত্রটি মেঝেতে নামাইতে উদ্যত হইল।

বালিকা উদ্বিগ্ন হইয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল—"না, না, ওখানে অনেক লোকের পায়ের ধূলা আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত খাবেন, অকল্যাণ হবে—আপনি বরং হাঁ করুন, আমি মুখে ফেলে দি।" অজিতের মুখ লাল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীরূপিনী বালিকার মুখের একটী শিরাও এই কার্য্যে চঞ্চল হইল না। এই কর্ত্তব্যপরায়ণ মেয়েটির মুখের মাধুর্য্যে যে পবিত্র গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান ছিল, তাহা তখন নারীর পরিপূর্ণ মহিমায় সমুজ্জ্বল।

বালিকা সেদিন আপনাআপনি অনেকবার হাসিয়াছিল, কেবলই তাহার অজিতের রসপ্লাবিত অবস্থাটি স্মরণ হইতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারে একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কিছু বিষয়সম্পত্তিও আছে। দু-চার হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ যে ছিল না, তাহাও নয়।

শ্যামাচরণ বাবুর কন্যার নাম নির্ম্মলা। মেয়েটির বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের পেটে আর অন্ন যায় না, চারিদিকে পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু কোথাও সুবিধা হইতেছে না। আজকালের দিনে পাত্রের অভাব নাই; কিন্তু সুপাত্র খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ ব্যাপার, কঠিন সমস্যা।

নির্ম্মলার অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে, কিন্তু কোনটিই শ্যামাচরণবাবুর মনোনীত হইতেছে না। তাঁহার ইচ্ছা নির্ম্মলাকে একটী সচ্চরিত্র, লেখাপড়াজানা ছেলের হাতে অর্পণ করেন। ইহাতে তাঁহার যাহা কিছু আছে তাহা ব্যয় করিতে তিনি অনুমাত্র কুণ্ঠিত নন। শ্যামাচরণবাবু মনে মনে একরূপ সংকল্প করিয়াছেন, মেয়েটির বিবাহ দিয়া কাশী যাইবেন।

মহিনের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এই বালিকার হাতেই মিষ্টান্নের ভাণ্ডার সমর্পণ করা হইয়াছিল, সে আজ ছয় মাসের কথা। নির্ম্মলা মহিনদের আত্মীয়া।

শ্যামাচরণবাবু তাঁহার পশ্চিমনিবাসী অনেক আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন। সেখানে দুই একটী সৎপাত্র আছে, কিন্তু তাঁহাদের অভিভাবকবর্গ কন্যা না দেখিয়া কোন কথা দিতে পারেন না। তাঁহারা অনেকেই মেয়ে দেখিতে চান। কেহ কেহ মেয়ের ফটো পাঠাইতে লিখিয়াছেন।

কন্যা সঙ্গে করিয়া, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করা বড় লাঞ্ছনা। অগত্যা তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, একবার কলিকাতায় কালীদর্শন করিয়া নির্ম্মলার খানকয়েক ফটো তুলাইয়া আনিবেন।

কালীদর্শন করিয়া ফিরিবার মুখে শ্যামাচরণবাবু পথের উপর ধর্ম্মতলার মোড়ে, এক ফটোগ্রাফের দোকানে গিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ম্যানেজারকে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"দেখুন, ছবি তোলাবার 'বাতিক্ টাতিক্' আমার নাই, এ সব আপনাদের আজকালকার ফ্যাসান্। আমার এই মেয়েটিকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি মশাই! বিবাহের জন্য চারিদিক্ হতে ফটো চাইছে। কি করি সেই জন্যই আসা।"

ম্যানেজার খুব সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"সে জন্য কোন চিন্তা নাই, এখনি ছবি তুলে নিচ্ছি।"

নির্ম্মলার ছবি তোলা হইলে শ্যামাচরণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে আন্দাজ পাব ?

"আপনি এখানে কোথায় আছেন ?"

"আমি এখানে থাকি না ; অদ্যই বাড়ী যাইব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিবেন।" ঠিকানা ও মূল্য প্রদান করিয়া শ্যামা-চরণবাবু কন্যাসহ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ছুটিতে অজিত বাড়ী আসিয়াছে। বাড়ীতে বৃদ্ধপিতা হরিহরবাবু, সীতার ন্যায় স্নেহপ্রবণা বৌদিদি শৈলবালা, আর একটী ছোট ভাই ; সে বৌদিদির কাছে "ক খ" পড়ে ; মাঝে মাঝে দুই একটা বুলবুলির বাসা অপহরণ অপরাধে সে যে বৌদিদির সস্নেহ তিরস্কারের আসামী না হয়—এমন নয়, তবে তাহা সঙ্গদোষে পড়িয়া।

শৈলবালা বলিলেন—"ঠাকুর-পো তোমার ছবিখানি এবার ভাল হয় নি। ওতে যেন তোমার একটু আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে, কই মায়ের সঙ্গে তোমার যে ছবি তোলাবার কথা বলেছিলে সে ছবি আন্‌লে না ?"

অজিত বলিল—"এবার কলিকাতা গিয়ে সে ছবিখানি তৈরী

কর্‌তে দেব।” অজিত তখন আহারে বসিয়াছে। অজিতের পিতা তামাক সেবন করিতে করিতে সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈলবালা তাড়াতাড়ি হাতের উল্টাপিঠ দিয়া অবগুণ্ঠনের প্রসার অল্প পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন।

হরিহরবাবু পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বৌমা, অজিতকে সেই চারাগাছের আমটা দিও। মোহিতের হাতে পোঁতা গাছ।” মোহিত অজিতের অগ্রজ, পশ্চিমে কর্ম্ম করেন। বৃদ্ধ পিতার সেবার অবহেলা হইবে, ভ্রাতা অধ্যয়নের মধ্য হইতে অবসর পাইয়া শান্তির আশায় গৃহে আসিলে কষ্ট পাইবে, এই সকল নানাকারণে তিনি শৈলবালাকে কর্ম্ম-স্থানে লইয়া যাইতে পারেন নাই। শৈলবালাও ছোট দেবর দুইটিকে যত্ন করিয়া, শ্বশুরের সেবা করিয়া অত্যন্ত সুখী।

হরিহরবাবু প্রস্থান করিলে নানাকথা আলোচনা হইতে লাগিল। কলিকাতার গল্প হইল, মেসের বামুন কেমন রাঁধে সে কথা হইল, পরিশেষে অজিত মহিন-দার ছেলের ভাতের কথা পাড়িল।

অজিত এবার কলিকাতা হইতে আসিবার সময় মনে করিয়াছিল বাড়ীতে গিয়া বৌ-দিদিকে শুনাইতে হইবে, সে কত বড় একজন কাজের লোক হইয়াছে। অতএব কাজটার একটা সবিস্তার বর্ণনা করিতেই হইবে।

সে হঠাৎ বলিল—“আচ্ছা বৌদি, বল দেখি মহিন-দার ছেলের ভাতে কে মিষ্টান্ন পরিবেশন করেছিল?”

“কে? তোমার মহিন-দা নিজে নিশ্চয়।”

“হলো না।”

“তবে কে?”

"স্বয়ং শর্ম্মা অজিতকুমার ; তোমার বিচারে যে সংসারের কোন কর্ম্ম করতে সম্পূর্ণ অপারক।"

তা'হ'লে নিশ্চয় সকলে মিষ্টান্ন পায় নাই। কা'রো পাতে অপচয় হ'য়েছে, আর হয় ত কেউ চেয়েও পায়নি।"

"একথা আর বলতে হয় না।"

"তবে হয় ত ভাঁড়ারী খুব হুঁসিয়ার লোক ছিলেন, বেশ দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়েছিলেন।"

"না বৌদিদি, তোমার বেশ সুন্দর যুক্তি। আমি পরিশ্রম ক'রে প্রাণ বাহির করলাম—এদিকে তোমার বিচারে ভাঁড়ারীর যশ হলো।"

শৈলবালা অজিতের কথায় প্রতিবাদ করিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অজিত কিন্তু ভাঁড়ারীর যশে তেমন জোরে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইল না। শৈলবালা বাধা দিয়া বলিলেন—"হাঁ ঠাকুরপো, ভাঁড়ারীটি বোধ হয় বেশ কার্জের লোক ছিলেন ?"

"ঠিক তোমার মতন বৌদি ! সর্বদিকে তার দৃষ্টি—কিন্তু ছেলেমানুষ।"

কে তিনি ?

"বোধ হয় মহিন-দার কোন আত্মীয়া হবেন।"

"কত ছেলেমানুষ ঠাকুরপো ? তার বিবাহ হয়েছে ?"

"বিবাহ হয়েছে, কি না হ'য়েছে অতশত জানি না।" একটু থামিয়া ঢোক গিলিয়া বলিল "ঠিক কথা বলবো বৌ-দি—তার বিয়ে বোধ হয় হয়নি—কিন্তু তার বিবাহের বয়স হয়েচে।"

"তুমি কেন তাকে বিবাহ কর না ? আমরা মাঝ থেকে একজন বিচক্ষণ ভাঁড়ারী লাভ ক'রে ফেলি—তোমারও কাজের লোক বোলে নাম বেরিয়ে যায়।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন অজিত উক্ত ফটোগ্রাফার কোম্পানির ম্যানেজারকে গিয়া বলিল, "ওহে তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।"

"উপকার টুপকার বড় একটা আমার কুষ্টিতে লেখে নাই। তোমার বিবাহের বরযাত্রী যেতে হবে নাকি ?"

অজিতের সহিত ম্যানেজারের বন্ধুত্ব ছিল। গড়ের মাঠে খেলা দেখিতে আসিলে অজিত প্রায়ই এখানে একবার করিয়া 'ঢু' মারিয়া যাইত। সে উত্তর করিল "অতটা সৌভাগ্য তোমার এখনও হয়নি। অদৃষ্টে থাক্‌লে তো যাবে।"

"তার আর দুঃখ কি ! তোমার বাবাকে লিখে পাঠাই, বিবাহের জন্য ফটো তুলতে এসেছে, তার বিবাহটা শীঘ্র দিয়ে দিন। আমি একটা সুন্দর মেয়ে দেখেছি।"

"ঘটকবিদায়টা তা'হ'লে ভাই কিন্তু আমি স্বহস্তে করবো। তখন যেন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবার মধ্যে একটা কৌশল আছে ব'লে বড়াই করো না। এখন কাজের কথাটা শুন্‌বে কি ?"

"বল্‌তে আজ্ঞা হোক।"

"দেখ, সেদিন আমার যে নূতন ছবি তুলেছিলে তা দেখে আমার বৌদিদি মহা চটেছেন, বল্লেন মার ছবি ঐ ফটোর সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। এই নাও আমার মার ছবি, আর এই নাও আমার ফটো। এখন তোমায় কর্‌তে হবে কি জান ? একখানি চেয়ারে মা উপবেশন ক'রে আছেন, আর আমি তাঁর পায়ের কাছে ব'সে আছি। কবে পাব বল ?"

"তাও কি কখন হয়!"

"নিশ্চয় হয়, পাঁচশোবার হয়, হ'তেই হবে, আমি চাই বৌদিদি যেমন বলেছেন, তেমনি তাঁকে চম্‌কে দিতে হবে।"

ম্যানেজার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। কর্ম্মচারী সে সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, কথাটা তাড়াতাড়ি শুনিয়া প্রস্থান করিলেন, বুঝিলেন কি না ভগবান জানেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"দেখি বাবা, কেমন ছবি এলো" বলিয়া নির্ম্মলা যেখানে শ্যামাচরণ বাবু ছুরি দিয়া পার্শেলের বাঁধন কাটিতেছিলেন, সেখানে গিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিল। বাঁধন শিথিল হইতেই ছবিগুলি পিছলাইয়া ঘরের মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িল। একখানি ছবি নির্ম্মলা তুলিয়া লইল। কিন্তু ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই সে চমকিয়া উঠিল—দেখিল চিত্রে তাহার পায়ের কাছে একটী যুবক উপবেশন করিয়া আছে। নির্ম্মলা যুবকটির মুখের প্রতি তাকাইয়া ছবিখানি কম্পিতহস্তে মেঝের উপর নিক্ষেপ করিল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল—হৃদয়ের মধ্যে একটা প্রবল ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সরমে মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কয়মুহূর্ত্তের জন্য কবে একদিন কাজের মাঝখানে সে

আসিয়াছিল—কাজের অবসানে সে ত চলিয়া গিয়াছে, আজ এমন লজ্জা দিতে কেন সে এই ছবির মাঝে আসিয়া বসিল। নির্ম্মলা চক্ষু তুলিয়া পুনরায় ছবির দিকে তাকাইতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল সমস্ত ছবিগুলির পার্শ্বে সেই মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে যত মনে করিতেছে সেদিকে তাকাইবে না, ততই যেন বল্গাবিহীন তুরঙ্গের মত নয়ন দুটি সেই দিকে ছুটিতেছে।

শ্যামাচরণ বাবু একে একে ছবিগুলি তুলিয়া দেখিলেন, বলিলেন "সুন্দর হ'য়েছে কি বল—মা নির্ম্মলা ?"

এই প্রশ্নে নির্ম্মলা সরমে মরমে মরিয়া গেল ; মনে মনে ভাবিল "বাবা কি বলেন ছাই", কিন্তু কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। শ্যামাচরণবাবু কন্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নির্ম্মলার মুখের ভাব দেখিয়া তিনি শঙ্কিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি নির্ম্মলার পরিত্যক্ত ছবিখানির প্রতি নিপতিত হইল। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কোন কথা না কহিয়া ব্রাহ্মণ সেই দিনই ফটো-গ্রাফারের উদ্দেশে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। নিম্মলা নির্ব্বাক হইয়া রহিল, পিতাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ফটোগ্রাফার কোম্পানির ম্যানেজার ছবি পাঠাইবার দুই তিন দিন পরে একদিন অফিস বন্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ

করিতেছেন, এখন সময় দেখেন শ্যামাচরণবাবুর কন্যার বারখানির এক-খানি ছবি তাঁহার টেবিলের একপার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। মনে করিলেন, প্যাক করিবার সময় নিশ্চয় ভুল হইয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই মর্ম্মে পত্র লিখিতে বসিলেন। কিন্তু সেদিন অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় পত্র লেখা বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে বাধ্য হইতে হইল, কারণ তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ ছিল।

শ্যামাচরণবাবু কলিকাতা আসিয়া সেই ছবিখানি ও বাকি এগারখানি ছবি ফেরত দিয়া ম্যানেজারকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিলেন। তিনি এত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নয়নে অশ্রু জমিয়াছিল। ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন "ভাবিয়া দেখুন অনূঢ়া কন্যার পক্ষে এর অপেক্ষা অপমান আর কি আছে বলুন দেখি? যদি অন্য কাহারও হাতে এই ছবি পড়িত, তবে আমার জাত মান সর্ব্বস্ব যাইত না কি?"

ম্যানেজার যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কিন্তু ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার বড় বেশীক্ষণ লাগিল না। কিরূপে কি ঘটিয়াছে, তাহা খুব মিষ্ট কথায় শ্যামাচরণবাবুকে বুঝাইয়া করজোড়ে অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কর্ম্মচারীকে তাঁহার সম্মুখে ডাকাইয়া আনাইলেন ও বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন। বারখানির যে ছবিখানি পড়িয়া ছিল তাহাও দেখাইয়া অন্য একজন ভদ্রলোক যে এই প্রকারের ছবির আদেশ দিয়াছেন তাহাও সবিস্তার জানাইলেন। পরিশেষে বলিলেন "এখন দেখিতেছি তাঁহার জননীর স্থানে আপনার কন্যার ফটোখানি ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন যে, তাঁহার ফটোগুলি এখনও পাঠানো হয় নাই।"

ব্রাহ্মণ ইহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন; যেন আর সে লোক নন;

বলিলেন "মশাই, মেয়েটির বিবাহ না দিতে পারিলে আর নিস্তার নাই, আহারনিদ্রা একরূপ ত্যাগ হইয়াছে বলিলেই হয়।"

ম্যানেজার খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে কহিলেন "একটা কথা বল্‌ব কি?"

"কি বলুন না। আপনাদের এখানে তামাক টামাক নেই, কেমন?"

"আজ্ঞে না। চুরুট আনিয়ে দিব কি?"

"না, না ওগুলা ছাই খেলেই কেমন কাসি আসে। হাঁ, কি বল্‌ছিলেন?"

"একটী পাত্র আছে। পাত্রটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—যেমন পড়াশুনায় তেমনি দেখ্‌তে। এম, এ পড়্‌ছে—আপনি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারেন।"

"কোথায় থাকেন?"

"তাঁদের বাড়ী সুলতানপুর। ছেলেটি বহুবাজারের একটী মেসে থাকে।"

"বটে, বটে, এ সংবাদটী দিয়ে যথেষ্ট উপকার কর্‌লেন। এখন আমাদের পাল্‌টী ঘর হ'লে হয়। তবে সেটা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ; একবার ছেলেটী দেখে যাই। বাড়ির নম্বরটা কত?

"আচ্ছা একটু অপেক্ষা করুন। মহিনবাবুকে একখানি পত্র দিই, তিনি আপনাকে সকল সংবাদ দিতে পার্‌বেন।"

"তিনি কে?"

"ছেলেটির সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু।"

"মহিনবাবুর বাড়ী কোথা জানেন কি?"

"গোলোকপুর।"

"গোলোকপুর? অ্যাঁ! আমাদের মহিন! তার বাসা জানি যে! কি

আশ্চর্য্য, আমি পৃথিবী মাথায় ক'রে বেড়াচ্ছি, আর তারই কাছে পাত্র। সবই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। বড় উপকার করলেন—মশাই" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সেদিন মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সায়াহ্নে পশ্চিম সীমান্তে নীল মেঘগুলি সোনালী মুকুট পরিয়া রণশ্রান্ত রথীর মত ঢলিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় রীতিমত কর্দ্দম জমিয়াছে। ছ্যাকরা-গাড়ীর গাড়ওয়ানগুলা বাবুদের পাইয়া বসিয়াছে। বেলফুল-বিক্রেতারা মোড়ে মোড়ে খুব হাঁকিতেছে। বৈকালে অজিত গড়ের মাঠে খেলা দেখিতে গিয়াছিল। ফিরিবার মুখে তাহার ফটোর কথা মনে পড়িয়া গেল; সে ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে অবলোকন করিয়া ম্যানেজার মুখের উপর একটী বিস্ময়ের ভাব প্রকটিত করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "এতদিন হ'য়েছিল কি? একবারে যে পথ ভুলে গিয়েছ। এমন কাজও দিতে হয়? ব্যবসা মাথায় থাক, শ্রীঘরবাসের সুবন্দোবস্ত হয়েছিল আর কি!"

"আজকাল ভূমিকা ব্যতীত কিছুই চলে না দেখ্‌ছি—কথার মধ্যে খানিকটা করে ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। ব্যাপারখানা কি? আসল কথা, আমার ছবি বুঝি হয়নি?"

ম্যানেজার অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। সেখানে তখন অন্য কেহ নাই দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "যদি বলি ছবি হয় নাই, তবেতো তুমি লাফিয়ে উঠ্‌বে, কেমন? আর যদি বলি, তোমার সে ছবি না হয়ে যুগলমূর্ত্তি হ'য়েছে, তা'হ'লে অবশ্য পুরস্কার দিতে পরাঙ্মুখ হবে না?"

"কথা হচ্ছে, আমার ছবি হয় নাই।"

"ছবি হ'য়েছে মশাই, তবে কিনা যুগলমূর্ত্তি হয়েছে। এখন যদি ফটোর সজীব মূর্ত্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাক তবে ছবি দেখাই।"

"আজকাল কি ফটোগ্রাফির সঙ্গে ঘটকালী ডিপার্টমেণ্টও খুলেছ?"

"না খুল্‌লে আর চলে কই। তোমাদের মত সুপাত্র যখন হাতে, তখন অলাভ নাই!"

"ঠাট্টা রাখ। আমার ফটো কই, দাও।"

"তোমার সে ছবি এখনও হয়নি; তবে যদি আমার প্রস্তাব অনুমোদন কর, তা'হ'লে তোমায় যুগলমূর্ত্তি দেখাই।"

"কই দেখি।"

"এত সুলভ মনে করো না। দর্শনী দাও।"

"দেখি না।"

"একেবারে যে উতলা হ'য়ে উঠ্‌লে।" ম্যানেজার যতই বিলম্ব করিতে লাগিল অজিতের ততই আগ্রহ বাড়িয়া যাইতেছিল, সে বলিল, "এখন দেখাও, নইলে চল্লাম।" ম্যানেজার অজিতের হাতে ছবি দিলেন। সে ফটো দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মুখের শিরাগুলিতে শোণিত-প্রবাহ যেন প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। তাহার মুখ হইতে তখন একটী কথাও বাহির হইল না। সে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে সংযমকে প্রবল

আকর্ষণে মনের মধ্যে টানিয়া রাখিতেছিল। বালিকার ছবি কেমন করিয়া এখানে আসিল? কেমন করিয়া সে এমন ভাবে, এখানে আসিয়া উপবেশন করিল? ভাঁড়ার ঘর, পরিবেশন, তোয়ালে প্রদান, পান দেওয়া, তাহার কষ্টে বালিকার সহানুভূতি, সবগুলি যেন রঙ্গমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তনের মত ধীরে ধীরে তাহার নয়ন-সম্মুখে একে একে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল "এ ছবিখানি কি সুন্দর, বেশ মানাইয়াছে।"

তাহাকে চিন্তিত, মৌন দেখিয়া ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন "কিহে, বোবা হ'য়ে গেলে নাকি? ছবি দেখেই "লবে" পড়লে যে—এখনও তারে চোখে দেখনি।"

"আচ্ছা কেমন ক'রে এ ছবি পেলে?"

"তুমি যে দেখ্‌চি, নিজের সম্পত্তি বোধে জেরা সুরু কর্‌লে। এখন রাজি কি না বল?

অজিত হাসিয়া বলিল "দোষ কি; না হয় ঘটকালী কর।"

নবম পরিচ্ছেদ।

গত রজনীতে ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রভাতের আকাশ, বেশ পরিষ্কার ও নির্ম্মল। পল্লীগ্রামের পথের উপর ঝড়ের চিহ্ন এখনও মিলাইয়া যায় নাই; রাশি রাশি সজিনাফুল, চ্যুত আম্র-মুকুল, ছিন্নবিচ্ছিন্ন

নবোদ্গত লেবুর পাতা পড়িয়া আছে—তাহাদের উপর এখনও কেহ চরণ ফেলে নাই, এখনও ভোরের বাতাসে ঝড়ের মৃদুমন্দ আভাষ আছে—অনেকগুলি বড় বড় বৃক্ষের শাখায় আশ্রয়চ্যুত পক্ষিকুল মুখোমুখী হইয়া বসিয়া ডানা ঝাড়িতেছে। অতি প্রত্যূষে অজিত অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। এত ভোরে সে কোনদিন উঠে না। গত নিশীথে তাহার ফুলশয্যা হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা সারারজনী প্রতিবেশিনীদের আড়িপাতার আশঙ্কায় শয্যার একপার্শ্বে আড়ষ্ট হইয়া কাটাইয়াছে। অজিতের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বেচারী কোনও মতে তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য একবার মাত্র অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল "ভাল আছি।" তারপর অজিতের লক্ষ প্রশ্ন সে মৌন-দুর্গ ভগ্ন করিতে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে শতবার নির্ম্মলার করপল্লবে অঙ্গুলি দিয়া অফুরন্ত অর্থহীন কথা লিখিল। সে সকল লেখা নির্ম্মলা বুঝিল কি না, তাহা সে একবারও ভাবিল না—অজিত মনে করিল তাহার সমস্ত কথা নির্ম্মলা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে, তাহা না হইলে সে প্রতিবাদ করিত। ইহা স্থির করিয়া সে আর কথা কহিল না। নির্ম্মলা যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তাহাকে তাহার হাতখানি সারারাত্রি অজিতের হাতের মধ্যে রাখিতে হইয়াছিল; নতুবা এখনি সে কথা কহিয়া গোল বাধাইবে, আর বাহিরের খিলখিল হাসিতে সে সরমে মরিয়া যাইবে।

নির্ম্মলা অজিতের বহুপূর্ব্বে গৃহ হইতে পলাইয়াছে। বেড়াইতে বেড়াইতে অজিতের স্মরণ হইল বৌ-দি বলিয়াছেন আজ তা'কে পরিবেশন কর্ত্তে হবে। নির্ম্মলা কেমন হুঁসিয়ার ভাঁড়ারী তার পরীক্ষা ও পরিচয় গ্রহণ করা হ'বে। অজিতের অত্যন্ত হাসি পাইল। মুখখানি উল্লাসে উৎফুল্ল হইল। যেখানে অজিত বেড়াইতেছিল, ঠিক তাহার সম্মুখেই

তাহাদের ফুলের বাগান। অনেকগুলি দুর্ব্বল কুসুম গত যামিনীতে আশ্রয়শূন্য হইয়া, ধরণীর কণ্ঠ বেড়িয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের শ্রী সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। যাহারা বিপদ কাটাইয়া বাঁচিয়া আছে, তাহাদের সংসারে যেন একটা জয়োল্লাস পরিদৃষ্ট হইতেছে। অজিত গোটাকতক গোলাপফুল তুলিল। পরে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই বৌ-দিদির সহিত সাক্ষাৎ হইল।

"ঠাকুর-পো এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলে? ফুল আন্‌তে? তা অন্য কাউকে বল্লেইতো হ'তো।"

"না। একটু বেড়াতে।"

এই নির্ব্বাক কোমল কুসুমগুলি যে একটা লজ্জা আনিতে পারে এবং তাহাকে প্রভাত হইতেই সারাদিনের নিভৃত সঙ্কোচের মাঝখানে এমন নির্দ্দয়ভাবে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, তাহা কিন্তু অজিত ফুল তুলিবার সময় অনুভব করিতে পারে নাই।

মধ্যাহ্নে অজিত কক্ষে উপবেশন করিয়া একখানি পত্র পড়িতেছে, এমন সময়ে শৈলবালা সেখানে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর-পো, পরিবেশন করবে এস। ও কার চিঠি? কখন এলো?"

"সেই ফটোগ্রাফার বন্ধুর।"

"তিনি আজ আস্‌বেন ত?"

"তিনি আস্‌তে পারবেন না, সেইজন্য চিঠি লিখেছেন।" শৈলবালা পত্র কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন "মায়ের অসুখ, যাইতে পারিলাম না বলিয়া ভাই, কিছু মনে করিও না। আর একদিন গিয়া তখন গিন্নীর হাতের রান্না খাইয়া আসিব। তোমার শ্বশুর মহাশয়কে আমার প্রণাম দিও। আর তাঁর আশীর্ব্বাদ হ'তে যেন বঞ্চিত না হই দেখো। ব্রাহ্মণ সেদিন অত্যন্ত চটিয়াছিলেন।

কিন্তু ভগবান যে এমন মিলন কর্‌বেন তা কে জান্‌ত বল! একটী পার্শেল পাঠাইলাম। উহাতে এক ডজন "যুগলমূর্ত্তি" আছে। উহার মালিক না থাকায় তোমাকে উপহার দিলাম। তুমি যার পায়ের নিকট তিনি যদি তোমাকে পছন্দ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এরূপ ভুল বড় দোষের নয়। কবে নূতন ছবি তুলিতে হইবে সত্বর জানাইবে। ঘটকবিদায়টা স্বহস্তে না করিয়া গিন্নীর হস্তে হইলে হয় না? তুমি যে কৃপণ তাই আশঙ্কা, ইতি।"

বৌ-দিদি আগ্রহ-উৎসাহভরে বলিলেন, "ছবিগুলি কই?"

"এই যে কোথায় রাখ্‌লাম।" অজিত এদিক-ওদিক চাহিতেই, শৈলবালা শয্যা হইতে ছবিগুলি লইয়া তাড়াতাড়ি হাসিতে হাসিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

বাহিরে আসিতেই দেখিলেন নির্ম্মলা ধীরে ধীরে সেদিকে আসিতেছে —তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে শৈলবালা বলিলেন, "এটা ভাই তোমার ভারি অন্যায় হ'য়েছে, নয় কি সৈথ?" বলিয়া তাহার হাতে একখানি ফটো দিলেন। নির্ম্মলা একবারে ঘামিয়া উঠিল। কিন্তু ফটোখানি ফেলিয়া দিতে পারিল না, অঞ্চলের মধ্যে আগ্রহে লুকাইয়া ফেলিল।

অজিতকে কোন মতে সেদিন পরিবেশন করাইতে পারা গেল না। সে কেবলই হাসিয়া হাসিয়া পলাইতে লাগিল। ভাঁড়ারে একখানি চৌকির উপর বসিয়া নির্ম্মলা অবগুণ্ঠনের মধ্যে অজস্র ঘামিতেছিল। পরিবেশনের দিনটা যেন তাহার চক্ষের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। শৈলবালা একবার অজিতের দেখা পাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর-পো পরিবেশন কর্‌বে না? আমিতো জানি তুমি কোনও কাজেরই নও।"

অজিত বৌ-দিদির কথায় যেন ভাবী সুখ-সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতম মূর্ত্তি

দেখিতে পাইল, ভাবিল নিখিলের দুঃখ দৈন্যের মধ্যে সুখ ও শান্তির সুমিষ্ট সুধাভাণ্ডটি হস্তে লইয়া কোমল দৃষ্টিতে নির্ম্মলা যেন একান্তে তাহাকেই আজ সাদরে পরিবেশন করিতে আহ্বান করিতেছে।

মাঝি।

—:*:—

(১)

এক দিন সন্ধ্যায় একটু পূর্ব্বে কাঁসাইয়ের খেয়াঘাটে স্বেদসিক্ত কলেবরে আসিয়া দেখি, ঘাটে খেয়ানৌকা নাই। পরপারে যাত্রীরা আকাশে মেঘ দেখিয়া বুঝি আলো থাকিতে থাকিতে পাড়ি দিয়াছে! খেয়াঘাটের উপরেই একটা সুবৃহৎ বটগাছ, বটগাছটাই পারঘাটের নিশানা। নদীতীরে ঘন হোগলার বন। বহুদিন হইল এই ঘাটে পার হই নাই। পূর্ব্বে যখন কল্যাণপুরে অবস্থান করিতাম, তখন দুই বেলা এই ঘাটে পারাপার হইতাম—ঘাটে আসিয়া 'নিতাই' বলিয়া ডাকিবার অবসর সহিত না, যেখানেই সে থাক,—নিতাই উত্তর দিত "একটু দাঁড়ান, এই আমি এলাম বলে।" তাহার শ্রবণশক্তি অসম্ভব তীক্ষ্ণ ছিল। হয়ত, কোন দিন নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে, নৌকা প্রায় পরপারে পৌঁছায় পৌঁছায় হইয়াছে—আমরা স্বভাবতঃই দূর হইতে চীৎকার করিতে করিতে আসিতাম "নিতাই" নৌকা নিয়ে আয়—বেলা হ'য়ে গিয়েছে"—অমনি উত্তর আসিত—"এই এলাম বলে, একটু দাঁড়ান।" এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কুকুর 'বাঘা' চীৎকার করিয়া সাড়া দিত—এইরূপ উত্তর শুনিবার লোভে আমি অনেক দিন নিতাইকে দেখিতে পাইলেও অনর্থক ডাকিতাম।

রাত্রিদিন নিতাই ঘাটে থাকিত। বেচারীর সংসারে আপনার বলিবার কেহ ছিল না। খেয়া দিয়াই সে তার জীবনের খেয়া শেষ করিয়া আনিতেছিল।

গ্রামের ভিতর নিতাইয়ের একটী ভগ্নকুটীর; কোনও দিন তাহার সংস্কার হইতে দেখি নাই। তাহাকে সেখানে বড় দেখিতে পাওয়া যাইত না—সে সংসারের সকল মায়া কাটাইয়া খেয়াঘাটে তাহার একমাত্র অবলম্বন—সেই জীর্ণ তরণীখানির উপর বাঘার কণ্ঠ জড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। যে যখন আসিত, তখনই তাহাকে পার করিয়া দেওয়াতেই তাহার সুখ ছিল। কেহ যদি বলিত "নিতাই তুই আবার বিয়ে কর, সংসার কর, এ রকম ক'রে কয় দিন বাঁচ্‌বি বল্‌?" সে তখন তাহার বড় বড় গোল সরল চক্ষু দুইটী তাহার মুখের উপর রাখিয়া উত্তর করিত "আর ক দিনই বা বাকী, বিয়ে ক'রে পায়ে শিকল প'রে মিছে কষ্ট পাব, আর পার করার এমন সুখটী হ'তে বঞ্চিত হব বইত নয়!"

"তোর কি ঘরে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না, দিন রাত এই একটানা খাটুনিতে কি তোর বেজার ধরে না—কেবল জলের উপর থাক্‌তে কষ্ট হয় না?"

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিত "কাজ কই দাদা, কজনকেই বা পার করি। ঘরের মধ্যে চুপ ক'রে পড়ে থাক্‌তে কখন শিখিনি।" তারপর অশ্রুসজল চক্ষে সে বলিত "মেয়েটা যখন আমাকে ছেড়ে পালায় তখন তাহার পোষা বাঘাটাকে আমার কাছে দিয়ে যায়। সেই অবধি বাঘাটা যেন মেয়েটার সব কথা আমাকে মনে ক'রে দেয়। তাই বাঘাকে নিয়ে সকল জ্বালা ভুলে আছি। নইলে সব ফেলে এতদিন একদিকে চ'লে যেতাম। ঘরের মধ্যে যদি কোন দিন গিয়ে পড়ি, ত ঘুম হয় না—ভয় হয়, পাছে চাপা পড়ে মরি। ঘরের মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠি, নৌকার উপর শুয়ে—নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে বাঁচি—কোন ভয় নেই, সব খোলা; হাত পা ছড়িয়ে আরাম পাই—শুয়ে শুয়ে দেখি, আকাশে মেঘগুলা কেমন ছুটে

ছুটে বেড়ায় ; আর মনে হয়, ওরাও বুঝি কোন বড় সাগর-পারে খেয়া দিচ্ছে !"

কেউ যদি বলিত "নিতাই, তোর ঘরখানা মেরামত কর্—নইলে হয় ত কোন্ দিন প'ড়ে যাবে।" নিতাই বলিত "কার জন্য আর নূতন ক'রে মায়ার গিরো বাঁধ্‌ব ? আশীর্ব্বাদ কর, দাদারা—যেন এই খেয়া দিতে দিতেই আমার খেয়া শেষ হয়।"

নিতাই বড় মিষ্টভাষী ছিল। পরিশ্রম করিবার জন্যই যেন বেচারী বলিষ্ঠ দেহ ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার মুখে অসন্তোষের ভাব কোনো দিনই দেখা যাইত না। সদাই হাস্য করিয়া, সকল সময় গান গাহিয়া সে বেশ আনন্দ উপভোগ করিত। নৌকার হালের উপর তাহার সেই সুদৃঢ় বাহুর ভর দিয়া, দেহ হেলাইয়া যখন সে হাসিতে হাসিতে বলিত "ঠিক হ'য়ে বস, নড়ো চড়ো না" তখন আরোহী-দের মনে এই সাবধানতা বেশ একটু ভয়ের সঞ্চার করিত। তাহারা পরস্পর মুখের প্রতি চাহিয়া সুশিক্ষিত সৈনিকের মত নিতাইযের আদেশে সংযত হইয়া বসিত। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা নিতাই গান ধরিত ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাঘা কুকুরটা নাচিতে আরম্ভ করিত। সকলে আশঙ্কায় আত্মহারা হইয়া সেই পারের কাণ্ডারী নিতাইয়ের মুখের দিকে ভয়বিহ্বলনেত্রে তাকাইত, কিন্তু সে মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র থাকিত না। নিতাই গান বন্ধ করিয়া বলিত "কোন ভয় নেই, সংসারের মায়া কাটিয়েছি ব'লে তোমরা মনে ভাব্‌তে পারবে না পার করবার মায়া কাটিয়েছি ; পার করার মায়া পূরামাত্রায় আমার আছে।" তাহার সেই হাসিভরা আশ্বাস-বাণীতে এমন একটা অজ্ঞাত শক্তি নিহিত ছিল যে, এক দণ্ডে সমস্ত ভাবনা বাতাসের মুখে মেঘের মত উড়িয়া যাইত।

নিতাই যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহার প্রায় সমস্তই তাড়ী খাইয়া উড়াইয়া দিত; সামান্য অংশ বাঘার ও নিজের আহার্য্যের নিমিত্ত ব্যয় করিত। একটা পয়সাও সে সঞ্চয় করিতে পারিত না—কোনও কোনও দিন ভাঁড় ভাঁড় তাড়ী খাইয়া সে সেই বটগাছের তলায় বাঘার সঙ্গে গান ও নৃত্য জুড়িয়া দিত—যে দিন মাত্রা অতিরিক্ত হইয়া পড়িত, সে দিন পথের ধারে লোক জমিয়া যাইত। নিতাই উল্লাসে বহু পুরাতন ছ্যাৎলাধরা ঢোলকটা খুঁজিয়া বাহির করিয়া নির্দ্দয় ভাবে পিটিতে থাকিত। তাহারা দুই জনে এক সঙ্গে আহার করিত। কুকুর ও মানুষের মধ্যে যে প্রভেদ, যে সম্পর্ক, তাহা নিতাই ও বাঘার মধ্যে দৃষ্ট হইত না। নিতাই মনে করিত বাঘা তাহার আত্মীয়, সঙ্গী, পুত্র;—বাঘা মনে করিত, নিতাই তার গুরু, মন্ত্রী, দেবতা! এই অপরূপ প্রেমের কল্পনা করা, সাধারণের পক্ষে যথেষ্ট অভিনব ও অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান যে না হইত এমন নয়, তবে তাহারা নিতাইকে অনেক দিন হইতে এইরূপ দেখিয়া আসিতেছে বলিয়া বিস্মিত হইত না। বাঘাও সকলের প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। পারের পয়সা শুধু যে নিতাই পাইত, তাহা নয়,—বাঘার ভাগও নিষ্ফল যাইত না। তাহারও প্রতিদিন দুই এক আনা দান আদায় ছিল।

নদীকূলে দাঁড়াইয়া অনেকবার "নিতাই! নিতাই" বলিয়া হাঁকিলাম, কিন্তু আজ এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নির্জ্জন খেয়াঘাটে আঁধারের মধ্যে কেবল বাতাসের হু হু শব্দ বটগাছের দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাইল। ক্রমে নদীর উপর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। স্রোতের মৃদু মৃদু কলধ্বনি বেশ সুস্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল; কিন্তু নিতাই নাই, পারে যাবার উপায়—নৌকা নাই! আজ নিতাইকে যেন বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছিল,

তাহার সেই আশ্বাসবাণী শুনিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহার কোনও সাড়া আজ তেমন করিয়া জানান দিল না—বাঘাও একবার ডাকিল না। তবে কি নিতাই তার জীবনের খেয়া শেষ করিয়া পলাই য়াছে ?—নিরুপায় হইয়া কত রকম ভাবিতেছি, এমন সময় জলের উপর দূরে ঝপ্‌ঝপ্‌ দাঁড় ফেলার শব্দ শ্রুত হইল, মনে হইল তবে বুঝি নিতাই আসিতেছে।

যে নৌকায় পার হইলাম, সেখানি নূতন ; তাহার উপর ছই নাই ; নিতাইয়ের নৌকার উপর বেশ একটা সুন্দর ছাউনি করা ছিল,—সে যে তাহার মধ্যেই থাকিত !

আমি এই নূতন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি নিতাইয়ের কেউ হও ?"

"আজ্ঞে না ; আমি এ ঘাটে দু-বছর নৌকা চালাচ্ছি !"

"কেন,—নিতাই কোথা গেল ?"

এই প্রশ্নে সে যেন বিস্মিত হইয়া তীব্রদৃষ্টিতে আমার মুখের প্রতি চাহিল,—তাহার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে কহিল "কেন, কিছু কি শোনেন নি ?"

আমি বলিলাম "না, অনেক দিন এ অঞ্চলে আসি নাই ! নিতাই ভাল আছে ত ?"

"চুপ করুন,—চুপ করুন, শুনতে পেলে ভয়ানক ব্যাপার হবে।"

আমার মনে হইল নিতাইকে নিয়ে যেন একটা গূঢ় রহস্য চলিয়াছে—এই খেয়াঘাটের পারাপারের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। তখন পান্সী প্রায় কিনারার কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছিল—আমি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম "চুপ্ করব কেন ? কি হয়েছে ?"

নূতন মাঝি উত্তর করিল, "নিতাই কথা শুনতে পেলে এখনি এসে দাঁড়াবে। দুচারটা পয়সা না নিয়ে—ছাড়বে না! আহা, অমন ভাল লোক অমন হয়ে যায়—সবই অদৃষ্টে করে!"

মাঝি নিতাইয়ের আগমনটাকে যেন আশঙ্কা করিতেছিল,—তাহার কথার ভিতর হইতে নিতাইয়ের প্রতি দয়া, দুঃখ ও স্নেহ প্রকাশ পাইল; মনে করিলাম হয় ত সে এমন একটা গুরুতর অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে —যে তাতে বোধ হয়, তাহার পক্ষে নৌকা চালানো একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। নিতাইকে দেখিবার জন্য কেমন একটা প্রবল ইচ্ছা হৃদয়মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল। তাহার সেই সুগঠিত বিপুলদেহ, সেই থালারমত প্রকাণ্ড গোল মুখ, বড় বড় চোখ, সরল শান্তদৃষ্টি, উন্নত বিশালবক্ষঃ, লোহার মত কঠিন হাতের গুলি, বড় ঝাঁকড়া চুল, সবতেই যেন তাহার কেমন একটা বিশেষত্ব ছিল; আরোহীদের সাবধান করিবার জন্য সেই গুরুগম্ভীর শাসনবাণী শুনিতে বেশ লাগিত। সেই নিতাইয়ের কি হইয়াছে, সেই বা কেমন হইয়াছে—দেখিবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলাম।

আমাকে চিন্তিত দেখিয়া মাঝি কহিল "ঐ দেখুন! ঐ যে, তীরে হোগলার বন দেখ্‌ছেন, ঐ যে—হোগলার বন দুলে' উঠ্‌ল না? ঐ নিতাই এখনও তার বাঘাকে খুঁজ্‌ছে! বেচারী খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করেছে—কেবল লোকে দয়া করে' যা দুই একটা পয়সা দেয়, তাই দিয়ে তাড়ী খায়। দিন নেই, রাত্রি নেই, সকল সময় সে ঐখানে প'ড়ে আছে। এই নদীর কিনারা ছেড়ে কোথাও নড়বে না। যে দিন ঝড়ে ওর নৌকা উল্টে যায়, শুনেছি সেই দিন বাঘা কুকুর কোথায় ভেসে যায়। বেচারী নাকি সে দিন সমস্ত রাত 'বাঘা! বাঘা!' ব'লে

চেঁচিয়েছিল; সাঁতার দিয়ে দিয়ে তাকে খুঁজেছিল। তারপর থেকেই ওর মাথা কেমন খারাপ হ'য়ে গেছে।"

বাঘার অন্তর্দ্ধানের কথা শুনিয়া হঠাৎ একটা অতীতের কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন নৌকায় আমি আর একটী ভদ্রপরিবার এক-সঙ্গে পার হইতেছিলাম। নিতাই যে বাঘাকে কত ভাল বাসে, তা যে এ কাহিনী শুনিয়াছে সেই অবগত হইয়াছিল। বাঘা তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল, বাঘার গায়ে ভদ্রলোকের ছোট মেয়েটী স্নেহভরে হাত বুলাইতেছিল এবং মাঝে মাঝে হাততালি দিয়া উল্লাসে হাসিতেছিল। বাঘাও লাঙ্গুল ফুলাইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া বালিকার আনন্দে যোগ দিতেছিল। শেষে ভদ্রলোকটী নিতাইয়ের নিকট কুকুরটী কিনিতে চাহিলেন। কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার গান থামিয়া গেল, চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। যিনি পার হইতেছিলেন তিনি যে এক জন সমৃদ্ধিশালী লোক, তাহা তাঁহার স্ত্রীর গাত্রাভরণ হইতেই বেশ প্রকাশ পাইতেছিল। নিতাই অনেকক্ষণ নিরুত্তর রহিল; বুঝি এ প্রস্তাব তাহার পক্ষে বড়ই বেদনা-দায়ক হইয়াছিল।

বাবুটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম হবে বল? যত দাম চাও তাই দেব।"

নিতাই আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল; "দাম আর কি! যদি বাঘাকে আমার কাছ থেকে নেন; তবে খুকীটাকে আমায় দিন। আপনার যেমন খুকী, আমার তেমন বাঘা! আমার যে আর কেউ নেই, আমি কি নিয়ে থাক্‌ব?" এই কথাগুলির ভিতর দিয়া সে দিন বাঘার প্রতি তাহার যে ভালবাসা ও মমতা পরিস্ফুট

হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব! ইহা যে তাহার প্রাণের কথা! বাবুটী নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, তাঁহার স্ত্রীও অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন। যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রী অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে স্বামীকে কি বলিলেন—ভদ্রলোকটি স্নেহভয়ে বাঘার পৃষ্ঠে একবার ধীরে ধীরে হাত চাপড়াইলেন এবং নিতাইয়ের হাতে একটী টাকা দিয়া গেলেন।

এমন সময় আমাদের নৌকা আসিয়া তীরে ভিড়িল। তখন জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোক জলের উপর কাঁপিতেছিল; মাঝি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল—"ঐ দেখুন, নিতাই নদীর ধারে আসছে,—হয়ত এখনই বাঘাকে খুঁজতে জলে পড়বে,—ঐ রকম ক'রে লোকটা মারা যাবে।"

আমি অনিমেষনয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম; তাহাকে এখন দেখিয়া তাহার পূর্ব্বের আকৃতি স্মরণ করা যায় না, যে বাধনের ভয়ে নিতাই একদিন ঘর সারাইতে রাজি হয় নাই ও বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল সেই বাধনই যে অজ্ঞাতে তাহাকে কঠোর-ভাবে বাধিয়াছিল তাহা সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই। নিঃস্বার্থ ভালবাসার নিকট সবাই পরাজিত। নিস্তব্ধ নদীর ধারে আসিয়া নিতাই চারিদিকে চাহিল, তারপর 'বাঘা! বাঘা! আয়, খাবার এনেছিআয়'! বলিয়া সে নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অনেক দূর সন্তরণ করিয়া নিরাশ অন্তরে, ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নদীতীরে হোগলাবনের পার্শ্বে আসিয়া সে শুইয়া পড়িল। সে দৃশ্য কি মর্ম্মান্তিক, কি হৃদয়বিদারক তাহা বলিতে পারি না।

আমি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া ডাকিলাম "নিতাই!"

সে শূন্যদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

"নিতাই এই নাও, এই নোটখানা তোমার কাছে রাখ। এমন ক'রে নদীর ধারে যদি পড়ে থাক কদিন বাঁচবে? চল তোমার ঘরে থাকবে, আমরা যেমন ক'রে পারি, তোমার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিব।"

"বন্দোবস্ত করে দেবেন? তবে দাঁড়ান, আমার বাবাকে ডেকে আনি; সে নইলে আমি কার কাছে থাকব।" তখন 'বাবা, বাবা'! বলিয়া সে নদীর ধার ধরিয়া হোগলাবনের ভিতর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে আর ফিরিল না। কেবল নদী-তটে তাহার আকুল আহ্বানের প্রতিধ্বনি হইতেছিল "বাবা, বাবা আয়!"

পাশের খবর।

"মহাশয়, ওখানি কি কাগজ ?"

একজন বেহার অঞ্চলনিবাসী মুসলমান, ব্যাকুল স্বরে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট ট্রামের আরোহী হীরেনবাবুকে উক্ত প্রশ্ন করিলেন।

মুসলমানটির পরিধানে চুড়ীদার পায়জামা, অঙ্গে নবাবী আমলের চাপ্‌কান। বয়স অনুমান ষাট বৎসর। মস্তকের বাবরীকাটা শুভ্র কেশদাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। হীরেন বাবু যে বেঞ্চে ছিলেন, ঠিক তাহার সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া মুসলমান ভদ্রলোকটি স্ফটিকের মালা জপিতেছিলেন। সহসা কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ায় তিনি উক্ত প্রশ্ন করিলেন।

"বঙ্গবাসী" বলিয়া হীরেনবাবু অন্যমনস্কভাবে সেই বৃহৎ-কলেবর কাগজখানির একবার এপিঠ একবার ওপিট উল্টাইলেন।

বৃদ্ধ শশব্যস্তে উদ্বেগ আকুলিত স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহাতে কি পাশের খবর বাহির হইয়াছে ?"

হীরেনবাবু যেন ইহাতে একটু বিরক্ত হইলেন। কারণ কাগজখানি অনর্থক কিনিয়া যেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করিতেছিলেন। তাঁহার আত্মীয় বা পরিচিত কেহই পরীক্ষা দেয় নাই। তবে দুইটী পয়সা নিরর্থক ব্যয় করিলাম কেন ইহাই ভাবিতেছিলেন।

বৃদ্ধ এতক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় হীরেনবাবুর মুখের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া ছিলেন। হীরেন বাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের উপর পড়িলে, তিনি দেখিলেন, আশঙ্কা-উদ্বেলিত অন্তরে বৃদ্ধ তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে দৃষ্টিতে কি ব্যাকুলতা! সে দৃশ্য দেখিয়া হীরেনবাবু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "মহাশয় এ কাগজখানিতে পাশের খবর ছাড়া আর কোন সংবাদ নাই।" শুনিবামাত্র বৃদ্ধের হস্ত থর থর কাঁপিতে লাগিল,—মুখখানি একেবারে রক্তশূন্য হইল,—করস্থিত মালাছড়াটি কোলের উপর পড়িলে তাহা তিনি চেষ্টা করিয়াও তখন তুলিতে পারিলেন না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"মহাশয় 'বেয়াদবী' মাপ্ করিবেন। যদি অনুগ্রহ করে দেখেন, আবুজবর পাশ হ'য়েছে কি না—"

হীরেনবাবু শিক্ষিত নব্য যুবক। বেশ বিষয়সম্পত্তি আছে। কলিকাতায় দুইখানি বাড়ী। বাঁধাধরাব মধ্যে কোন কাজকর্ম্ম করেন না। সুতরাং 'জু' 'মিউজিয়াম' 'হক্‌সাহেবের' বাজার প্রভৃতি তাঁহার সময় কাটাইবার পক্ষে বিশেষ সহায়। তিনি সে দিন হাইকোর্টে একটা দায়রার মোকদ্দমা শুনিতে যাইতেছিলেন, এই প্রকার বাতিকও তাঁহার যে মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত না, তাহা বলিতে পারি না। 'পাশের খবর বাবু' বলিয়া যখন সচল ট্রামগাড়ীর পা-দান স্পর্শ করিয়া, কাগজ-বিক্রেতারা খরিদ্দার পাকড়াইবার জন্য তীব্রস্বরে চেঁচাইতেছিল, তখন হীরেনবাবু অন্যমনস্কভাবে 'বঙ্গবাসীখানি' কিনিয়াছিলেন; তারপর কেনার সার্থকতা লইয়া, যখন মনে বিষম গোল বাধিয়াছে, এমন সময় বৃদ্ধ মুসলমানের অনুরোধটি, হীরেনবাবুর অনিচ্ছাকৃত অমনোযোগিতার মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে অভদ্র প্রতিপন্ন করিতেছিল। বৃদ্ধ দুই একবার রাস্তার দুই পার্শ্বে যেন কাহার অনুসন্ধান করিলেন। বোধ হইল একখানি কাগজ

কেনাই তাঁর উদ্দেশ্য ; যখন সে চেষ্টা নিষ্ফল হইল, তখন তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে, অপরাধী আসামীর মত কহিলেন, "মহাশয়, দেখ্‌লেন কি ?"

হীরেনবাবু শিক্ষিত হইলেও নব্যযুবক। অপরিচিত ব্যক্তি সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যে এতটা অনুরোধ করিতে পারে, তাহা তাঁহার আধুনিক অধীত পুঁথির মধ্যে তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্নের একবার উত্তর প্রদান করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এবার বিরক্তভাবে বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিবামাত্র হীরেনবাবু তাঁহার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন না, বরং বিশেষরূপে লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলেন।

বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত অন্তরে, পুনরায় বলিলেন, "কি দেখ্‌লেন বাবু ?"

এ প্রশ্নটি হীরেনবাবুর অমনোযোগিতাকে যেন তীব্র উপহাস করিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "কি নামটী আর একবার বলুন ত, মাপ্ কর্‌বেন, ভুলে গিয়েছি।"

বৃদ্ধের স্বর তখন জানি না কি কারণে জড়াইয়া আসিয়াছে—তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে উত্তর করিলেন, "আবুজবর, কিছু দেখ্‌লেন কি ?"

তখন তাঁহার পক্ষে, এক পল যেন এক একটী সুদীর্ঘ যুগতুল্য।" কি এক সন্দেহ-দোলায় তাঁহার প্রাণ যেন আন্দোলিত হইতেছে। পাশের খবর জানিতে কি মানুষ এত অধীর হয় ?

(২)

তৃতীয় বিভাগ দেখিয়া হীরেনবাবু নাম পাইলেন না। তিনি হতাশ হইলেন, কারণ শৈশবকাল হইতে তাঁহার কেমন ভুল সংস্কার ছিল যে, মুসলমান বালক প্রথম শ্রেণীতে পাশ করিতে পারে না।

বৃদ্ধ পলকবিহীন নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে, কুঞ্চিত ললাটের উপর স্বেদবিন্দু সঞ্চিত হইতেছে। জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মানুষ যেমন ভাবে বিচলিত হইয়া উঠে, বৃদ্ধের অবস্থাও আজ ঠিক সেইরূপ।

তৃতীয় বিভাগের পর দ্বিতীয় বিভাগেও যখন নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন হীরেনবাবুর মুখমণ্ডল বৃদ্ধের অবস্থা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইল। তাহার পর প্রথম বিভাগের দুই চারিটী নামের পরই 'আবুজবর' নামটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, দেখিলেন সে প্রেসিডেন্সী হইতে পাশ করিয়াছে। একটু সন্দেহ হইল, মাদ্রাসা না হইয়া প্রেসিডেন্সী হইল কেন? একবারে পাশ হইয়াছে না বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কলেজ হ'তে পরীক্ষা দিয়েছিল?"

"প্রেসিডেন্সী থেকে, পেয়েছেন কি?"

"আবুজবর পাশ হ'য়েছে। প্রথম বিভাগে।"

বৃদ্ধ দুই হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া মর্ম্মস্পর্শী স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "খোদা! আল্লা! আঃ বাঁচলাম। কই! কই! মহাশয় নামটা একবার দেখান।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া সদ্যমুক্ত রুদ্ধ গিরিস্রোতের মত অশ্রু বহিতে লাগিল।

"এই যে, আপনি স্থির হউন, অধীর হবেন না।" বলিয়া তিনি নামটী দেখাইয়া দিলেন, বৃদ্ধ নামটীর উপর অঙ্গুলি-স্পর্শে যেন এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করিলেন। বঙ্গবাসীখানি অশ্রুপ্লাবিত হইল। আজ হীরেনবাবু দুইটী পয়সা ব্যয় সার্থক মনে করিলেন। বৃদ্ধ আনন্দে, কি দুঃখে ঠিক জানি না,—কারণ ইহাতে দুঃখের মত কোন কিছুই ছিল না—সহসা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া হীরেনবাবুর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

পুত্র বা প্রিয়জন পাশ হইলে আনন্দ হয়; সময়ে সময়ে সাময়িক দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু তাহার ভিতর এমন অভূতপূর্ব্ব ভাববিপর্য্যয় যা মরণবাঁচনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না।

(৩)

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। অত্যন্ত গ্রীষ্ম। পথে জনকোলাহল অনেকটা নীরব হইয়া আসিয়াছে। রৌদ্র বড় বড় প্রাসাদ-তুল্য গৃহগুলির সহিত বিবাদে আঁটিতে অপারগ হইয়া মধ্যরাস্তায় জমিয়াছে। রাস্তার কলগুলি মুক্তহস্তে তৃষাতুর পথিকদিগকে জলদান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। 'বরফ, বাবু বরফ' চীৎকারধ্বনি মাঝে মাঝে সুমধুর সঙ্গীতের মত কানে সুধাবর্ষণ করিতেছে।

হীরেন বাবু শ্যামবাজার হইতে আসিতেছিলেন। বৃদ্ধ তাহার একটু পর হইতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমশ্রেণীতে উহারা ভিন্ন আর দুইটী যাত্রী ছিলেন। তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে মশাই? কোন অসুখ আছে নাকি, পুলিস ডাকিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।"

হীরেনবাবু বলিলেন, "পুলিশ ডাকবার তত প্রয়োজন নাই। লোকটা সম্ভ্রান্তবংশীয় ব'লে মনে হচ্ছে, আমরা পরস্পর একটু সাহায্য করিলে ইনি এখনই সুস্থ হয়ে উঠবেন" বলিয়া তিনি কাগজখানি দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধের সংজ্ঞা হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার মস্তক হেলিয়া পড়িতেছে। কথা কহিবার শক্তি নাই; চেষ্টা করিয়াও যেন কথা বলিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নয়নের ভিতর প্রাণের আবেগপূর্ণ কৃতজ্ঞতাবাণী অশ্রুরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতি কষ্টে অদ্ধবিজড়িত স্বরে তিনি জানাইলেন, তালতলায় তাঁর বাড়ী। ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে হীরেন বাবু একখানি ভাড়াটিয়া

গাড়ীতে তুলিলেন। পথে তিনি বেশ সুস্থ হইলেন। বৃদ্ধ তাহার বাড়ী দেখাইয়া দিলেন, হীরেন বাবু গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করিলে, একটা সতর আঠার বৎসর বয়স্ক মুসলমানযুবক দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিল। গাড়ীর মধ্যে বৃদ্ধকে দেখিয়া ঔৎসুক্য-পূর্ণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে বাবা? অমন ক'রে বসে কেন? শুনেছেন, কি আল্লার ইচ্ছায় পাশ হ'য়েছি?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আল্লা মুখ রেখেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান কর, এমন অবস্থায় যেন কেউ না প'ড়ে।"

হীরেনবাবুর নিকট এই কথোপকথন যেন প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইল। আগাগোড়াটাই যেন কেমন একটা অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ!

(৯)

হীরেনবাবুর মনের ভিতর এই ঘটনাটি একটি অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করিল। এরূপ অবস্থায় কিছু জিজ্ঞাসা করাও ভদ্রোচিত নয় মনে ভাবিয়া তিনি নীরব হইলেন।

বৃদ্ধ ও তাঁহার পুত্র, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

"ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিলে সে জন্য এত ধন্যবাদ করা কেবল আমাকে লজ্জা দেওয়া" বলিয়া হীরেনবাবু বিনয়সহকারে বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

"মুসলমান বলিয়া যখন কিছু মনে করেন নাই, তখন মেহেরবাণী করে যদি আমাদের এই গরিবখানায় পদার্পণ করেন, তবে বড়ই অনুগৃহীত হব। আপনি আজ আমাকে পুত্র দিয়েছেন, এ ঋণ খোদা শোধ দিবেন।"

হীরেনবাবুর যেন সমস্ত ব্যাপারটা একটা জটিল সমস্যা বলিয়া মনে

হইল। এই প্রহেলিকার আবরণ উন্মোচন করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। তিনি কত প্রকার অনুমান করিলেন, কিন্তু কোনটীই তাঁহার মনঃপূত হইল না।

"আপনাকে বাতাস কর্‌তে হ'বে না। পাখাখানা আমাকে দিন" বলিয়া হীরেনবাবু হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক পাখাখানি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন।

আবুজবর কাতরস্বরে উত্তর করিল, "মাপ করবেন, উহাতে কোন দোষ নাই। আপনার সেবা কর্‌তে আজ যে সুখ তাহা কথায় জানান যায় না, আপনি আমার পিতার প্রাণরক্ষা করেছেন।"

"সে কি! ও কথা বল্‌বেন না। তাঁর এমন কিছু হয় নাই যে, তিনি মারা পড়্‌তেন। এরূপ করার কিছু বিশেষত্ব নাই।"

"কিন্তু আজ যদি পাশের খবর না পেতেন, বাবা তা হলে নিশ্চয়ই কল্পিত আশঙ্কায় জীবনত্যাগ কর্‌তেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

"পরীক্ষা প্রদান করিয়া ত অনেকেই প্রথম উদ্যমে সফলতা লাভ করেন না, ইহাত প্রায়ই দেখা যায়, তাহার মধ্যে যে মরণের আশঙ্কা আছে তা'ত মনে হয় না।"

"সাধারণতঃ মনে হয় না সত্য, কিন্তু আমার বাবার অন্তরের দারুণ বেদনার কথা শুন্‌লে আপনার সে সন্দেহ থাক্‌বে না।"

"যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে—"

আবুজবর বাধা দিয়া বলিল, "না, না, আপনাকে অত বিনয় প্রকাশ কর্‌তে হবে না।" এমন সময়, বৃদ্ধ বেশ ধীরভাবে আসিয়া সেখানে একখানি চৌকিতে উপবেশন করিলেন। একটু বসিয়া বলিলেন,—

"আবু, আমার ইচ্ছা তোমার আর বেশী লেখাপড়া শিখে কাজ

নাই।" তারপর হীরেনবাবুর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন মহাশয় ?"

হীরেনবাবু এরূপ প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিলেন, "কথাটা বেশ বুঝতে পারলাম না।"

"বুঝ্‌তে পার্‌লেন না ?" বলিয়া বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া উঠিলেন—বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত হইল ; অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে বিদ্যুতালোকে সর্প দর্শন করিয়া পথিক যেরূপ বিচলিত হইয়া উঠে, হীরেনবাবু সহসা বৃদ্ধের এই ভাবান্তর নিরীক্ষণ করিয়া সেইরূপ হইলেন। সমস্ত প্রকোষ্ঠটি প্রতিধ্বনিত করিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন—"বুঝতে পার্‌লেন না ?" বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ হইল। নয়ন হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি উন্মাদের মত হীরেনবাবুর হস্ত ধরিয়া পাশের ঘরে টানিয়া লইয়া চলিলেন। সে গৃহের দ্বার বন্ধ ছিল। বৃদ্ধ নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে সযত্নে রক্ষিত চাবিটি বাহির করিয়া দ্বার খুলিলেন।

হীরেনবাবু দেখিলেন গৃহটি পড়িবার ঘর, টেবিল চেয়ার সুসজ্জিত, দুইটী বড় বড় আলমারী সুন্দর সুন্দর বাঁধান পুস্তকে পরিপূর্ণ। একদিকে একখানি সোফা, তাহার উপর একটি সদ্যপরিত্যক্ত পরিচ্ছদ। গৃহভিত্তি-গাত্রে একটী মুসলমান বালকের তৈলচিত্র সংস্থাপিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ সেই চিত্রখানির দিকে অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে একটি প্রচ্ছন্ন কাতরতা প্রকাশ পাইল। বৃদ্ধ সেইরূপ আবেগপূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন,—

"মহাশয়, এই ঘরে সে পড়িত। তার মত মিষ্টভাষী, শান্ত, সুশীল

বালক দেখি নাই। দেখুন, দেখুন, ঐ ছবির দিকে একবার চেয়ে দেখুন, যেন কত অপরাধ করেছে। অপরাধীও নিজ পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বিচারকের প্রতি নয়ন তুলিয়া থাকে, কিন্তু দেখুন, কি নির্ম্মল, নম্রনত দৃষ্টি—সে যে কোন দিন আমার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিত না। আমি রহিমকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসতাম। মুসলমানদিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বড় প্রসারিত নয়, কিন্তু তার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল দেখে আমি তাহাকে উচ্চ-শিক্ষা দিব মনে করিয়াছিলাম," বলিতে বলিতে বৃদ্ধ নিজের বস্ত্র দিয়া টেবিলের উপর যে অল্প একটু ধূলা জমিয়াছিল, তাহা বিশেষ আগ্রহ ও স্নেহভরে মার্জ্জনা করিলেন। পরিচ্ছদটি বাতাসে বা কোন ক্রমে একটু স্থানান্তরিত হইয়াছে অবলোকন করিয়া তাহা কতই সন্তর্পণে সোহাগস্পর্শে সংযত করিয়া রাখিলেন।

হীরেনবাবু বলিলেন, "আপনি নিজে কেন কষ্ট করছেন, ভৃত্যকে ব'ল্লে ত সে সব ঠিক করতে পারে।"

বৃদ্ধ যেন একটু রুষ্ট হইয়া তীব্র কটাক্ষ করিলেন।

আবু হীরেনবাবুর কাণে কাণে বলিল, "বাবা নিজ হস্তে এই গৃহটি প্রতিদিন পরিষ্কার করেন, কাউকে কিছুতে হাত দিতে বা এ গৃহে প্রবেশ করতে দেন না।" বৃদ্ধ একটু স্থির হইয়া দেখাইলেন "এই চৌকিতে, সে দিন, সে ব'সে তার দুই বন্ধুর সঙ্গে হাস্য পরিহাস ও গল্প করছিল—সেবার সে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দেবে—অল্পদিন মাত্র বাকী। তাহাকে গল্প করতে দেখে সহসা কেমন একটু রাগ হ'ল, তিরস্কার করলাম, রহিম, তোমার পরীক্ষা আসন্ন মনে আছে, এমন করলে তুমি কোন দিন পাশ করতে পারবে না, অনর্থক সময়ের অসদ্ব্যবহার করলে কেহ পাশ হয় না, একথা যেন স্মরণ থাকে। আমার কষ্ট-উপার্জ্জিত

অর্থ যেন নষ্ট না হয়।' সে মস্তক নত করিয়াই উত্তর করিল, 'বাবা ভাববেন না, নিশ্চয়ই পাশ কর্‌ব। আপনার টাকা বৃথা যাবে না'।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়ন অশ্রু-সমাচ্ছন্ন হইল, স্বর আর্দ্র হইয়া জড়াইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, কিন্তু রহিম পাশ হ'ল না। বাড়ী ফিরে এসে, দুঃখে কষ্টে অভিমানে, সে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে না। জানি না কেন, দুই এক দিনের মধ্যে সে আমাকে ফাঁকি দিয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। তুচ্ছ টাকার জন্য কেন তা'কে আমি তিরস্কার করেছিলাম? তাই সে দিনরাত্রি দারুণ পরিশ্রম ক'রে অধ্যয়ন করেছিল ব'লে স্বাস্থ্যভগ্ন হ'য়েছিল," বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন। সেই চিত্রখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন,—"বাবা রহিম, ফিরে আয়, এই বৃদ্ধের জ্বালা-যন্ত্রণাপূর্ণ বক্ষের উপর ফিরে আয়। তোকে আর পাশ কর্‌তে হ'বে না। বৃদ্ধ পিতাকে কি এমন ক'রে সাজা দিতে হয়? আর কাউকে পাশ করতে বল্‌ব না।" বৃদ্ধের স্বর ক্রমে ক্রমে আর্দ্র ও ক্ষীণ হইয়া আসিলে, তিনি গৃহতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই মর্ম্মস্পর্শী বেদনাকাতর কথাগুলি শুনিয়া হীরেনবাবুর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি শশব্যস্তে পাখা লইয়া বৃদ্ধকে বাতাস করিতে লাগিলেন। আবু পিতার মস্তক সযত্নে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল, "বাবা, আমি আর পড়্‌ব না, 'পাশ' চাই না।"

* * * *

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া হীরেনবাবু যেন সকল দিনের মত নিজেকে সুস্থ ও শান্ত মনে করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধের কাতর-কণ্ঠের করুণ কথাগুলি তখন তাঁহার মাথার ভিতর একটা গভীর চিন্তা ঘনাইয়া আনিতেছিল।

পেঁপে।

—:*:—

স্কুলের ছুটি হইয়াছে। পথে বালকেরা গলাধরাধরি করিয়া বই বগলে বকিতে বকিতে বাড়ী ফিরিতেছিল। তালগাছের মাথায় অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণ আভা তখন ঝিকিমিকি করিতেছে। পল্লীপথে দুই একটী কুলবধূ কলসীকক্ষে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। এমন সময় বোসেদের বাগানের নিকট আজিমউদ্দীন দাঁড়াইল। সহপাঠী ললিতকে বলিল "এই গাছে একটা বুলবুলীর বাসা আছে। বোধ হয় বাচ্ছা হ'য়েছে, চল দেখিগে।"

"যদি ছানা থাকে, কে নেবে?"

আজিম কহিল "তুই একটা, আর আমি একটা।"

"যদি একটা থাকে?"

আজিম এবার একটু ভাবিল, পরে বলিল "তুই নিবি।" ললিত উল্লাসে আগ্রহে আজিমের গলা জড়াইয়া বলিল "তারপরে যেটা হবে, সেটা ভাই-তুই নিবি, কেমন?

আজিম বলিল "তাই হবে।"

কিন্তু উভয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইল। একটীও ছানা পাওয়া গেল না। তখন উভয়ে হতাশ অন্তরে গৃহে ফিরিল।

আজিমের বাড়ী অতিক্রম করিয়া অল্পদূর আসিলেই ললিতদের বাড়ী। আজিম ও ললিত উভয়ের মধ্যে পরম প্রীতি ও বন্ধুত্ব। ললিত প্রতিদিন ইস্কুলে আসিবার সময় আজিমকে ডাকিতে যায়। আজিমও

বন্ধুর আগমন অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাক। আজিমের জননী করিমনবিবি ললিতকে অত্যন্ত ভালবাসেন ও স্নেহ করেন।

সেদিন আজিম বাড়ীর কাছাকাছি হইলে হঠাৎ তাহার স্মরণ হইল "মা বলে দিয়েছেন যে ললিতের জন্য একটী পেঁপে আছে, বাড়ী যাবার সময় যেন নিয়ে যায়।"

ললিত পেঁপেটি হাতে করিয়া আনন্দে বাড়ী চলিল।

(২)

মহাদেবপুরে একটী এণ্ট্রাস ইস্কুল, একটী বাজার, ও একটী ছোট-রকমের পাঠশালা ছিল। এই ইস্কুলে হিন্দুমুসলমানের ছেলেরা একত্র বিদ্যাভ্যাস করিত এবং এইখান হইতে বেশ একটী সৌহৃদ্যভাব পরস্পরের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

ললিতের পিতা শিবশঙ্কর বাবু গোঁড়া হিন্দু। সময় সময় তাঁহার গোঁড়ামীর তর্ক অত্যন্ত হাস্যকর হইয়া উঠিত। তিনি এইরূপ মিলন মোটেই অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এই নিমিত্ত অনেকবার তিনি পুত্রকে অযথা ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

সে দিন তিনি বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। একটা সুর-কীর রংয়ের কুকুর উঠানের উপর পড়িয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তাঁহার পার্শ্বে দুইটা ছাগলছানা নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছে। ললিতের ছোট ভাই শান্তি বড় দুরন্ত, সে তখন একগাছি দড়ি দিয়া কুকুরের লাঙ্গুলের সহিত খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে ছাগলছানা দুইটার গলা বাঁধিতেছিল। এমন সময় ললিত পেঁপে হাতে করিয়া বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করিল। শান্তি দড়ি ফেলিয়া পেঁপের উদ্দেশে আগ্রহ ও উৎসাহভরে লাফাইতে লাফাইতে দাদার নিকট ছুটিল।

শিবশঙ্কর বাবু হুঁকাটি জানালার গায়ে ঠেসান দিয়া রাখিলেন ও একটী আকর্ণবিস্তৃত হাই তুলিয়া মুখের নিকট দুইবার তুড়ি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ও পেঁপে কোথায় পেলি ?"

ললিত পিতাকে বিলক্ষণ জানিত; এই প্রশ্নে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। বেচারীর মুখ হইতে একটী কথাও নিষ্ক্রান্ত হইল না।

তাহাকে নিরুত্তর অবলোকন করিয়া তিনি বজ্রনির্ঘোষে জিজ্ঞাসা করিলেন "কার গাছের পেঁপে চুরি করেছিস্?" এই অবসরে শান্তি পেঁপেটী আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে উৎসাহভরে হস্ত প্রসারিত করিল। ললিত পেঁপেটীকে যেন ভ্রাতার অস্পৃশ্য দ্রব্য জ্ঞানে তাহার নাগাল হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, "চুরি করব কেন?"

"তবে কোথায় পেলি ?"

"আমাকে দিয়েছে।"

"কে দিয়েছে ?"

ললিতের ওষ্ঠদ্বয় তখন আশঙ্কায় শুকাইয়া আসিতেছিল। সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল "আজিমের মা।"

ললিতের বয়স তের বৎসর। মুসলমানের দ্রব্য গ্রহণ করা হিন্দুর পক্ষে গুরুতর অপরাধ, অমার্জ্জনীয় কার্য্য, এই অপূর্ব্ব সংস্কারটা তখনও কেহ বালকের মস্তকে প্রবেশ করাইয়া দেয় নাই। সুতরাং বেচারি সকলকে যেমন দেখিত, আজিমকেও তেমন্ দেখিত এবং ইহার মধ্যে যে কি পাপ বা অন্যায় নিহিত রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

সে দিন সহসা সামান্য পেঁপেকে উপলক্ষ করিয়া ললিতের পিতার সমস্ত হিঁদুয়ানী পুত্রের বিপক্ষে ঝুঁকিয়া পড়িল।

শিবশঙ্কর হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুই ম্লেচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিস্। তোর পৈতে-টৈতে কিছু দিব না। তুই কোন্ সাহসে, মুসলমানের বাড়ী গিয়ে পেঁপে নিয়ে এলি? তোর কিসের অভাব হতভাগা? তুই কি খেতে পাস না?"

পেঁপের মধ্যে যে ম্লেচ্ছত্বের কোনও প্রকার অদৃশ্য বীজ নিহিত থাকিতে পারে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্তু ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোনও যুক্তিই মানিলেন না; এরূপ সামান্য কারণে শাসন নিষ্প্রয়োজন হইলেও তিনি অজস্র তিরস্কার করিলেন।

ললিত দুঃখে ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল। বালকের গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। শান্তি দাদার চক্ষে জল দেখিয়া বলিল—"দাদা, কাঁদিসনি, আমি পেঁপে নোব না।"

শিবশঙ্কর কান্না দেখিয়া ভুলিবার পাত্র নন। তিনি চক্ষু পাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"যা, এখনই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।"

বালক সকরুণ কাতর দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি তাকাইল—সে দৃষ্টি কত করুণ, কত বেদনা-পীড়িত। মনে মনে বলিল, "বাবা অপরাধ হ'য়ে থাকে, শাস্তি দিন, কিন্তু এ পেঁপে ফেরত দিতে বল্‌বেন না। তাহ'লে তার মার বড় দুঃখ হ'বে। আজিম রাগ করবে।" কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করিতে তার সাহসে কুলাইল না। প্রকাশ্যে বলিল "তবে হাটে—সেদিন পূজোর জন্য মছোলমানের ঠেঙ্গে পেঁপে কলা কিনেছেন কেন?" সহসা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হইল—শিবশঙ্কর আরও জ্বলিয়া উঠিলেন। বিকট গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "এখনই যা বল্‌চি, পাজি!" উপায়হীন

অকলঙ্কহৃদয় বালক অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে পেঁপেটি হাতে করিয়া আজিমদের বাড়ীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

দুঃখের কঠিন আঘাতে তাহার শিশু-হৃদয় তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া সে পেঁপেটি ফেরত দিবে, কেমন করিয়া মুসলমানের দ্রব্য গ্রহণ করায় পিতার কঠোর শাসনে অপরাধীর ন্যায় তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে সে কথার উত্থাপন করিবে, ভাবিয়া বালক অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। ললিত একবার মনে করিল, পেঁপেটি তাহাদের দরজার নিকট না বলিয়া রাখিয়া যাইবে। পরক্ষণেই মনে হইল আজিম দেখিতে পাইলে, যদি মনে করে আমি ফেলিয়া গিয়াছি, তবে হয় ত সে পুনরায় বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারে। তাহ'লে কি বাবা তাকে রাখ্‌বেন?

বালক ভাবিয়া আর কূল কিনারা নির্ণয় করিতে পারিল না। আজ যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় পড়িয়াছে। এত ভাবনা সে যে আর কোন দিন ভাবে নাই। এই সময় আজিমের পিতা কোথা হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি ললিতকে দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গো খোকাবাবু! আজিমের জন্য বুঝি দাঁড়িয়ে আছ? তা বাড়ীর মধ্যে এস না কেন? আমরা ত আর তোমাকে 'কলমা' পড়িয়ে দেব না।" ললিত বেশী কিছু বলিতে পারিল না। কেবল অত্যন্ত জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিল—"পেঁপেটা নিয়ে যান।" বৃদ্ধ মুসলমানের আহ্লাদের সীমা রহিল না, তিনি আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের গাছের বুঝি? আজিমের জন্য এনেছ? বাঃ বাঃ বেশত।"

এবার বালক ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ রগড়াইতে

রগড়াইতে কহিল "আমাদের গাছের নয়। আজিম আমাকে দিয়াছিল। বাবা বল্লেন ফেরত দিয়ে আয়।" ইহার অধিক আর সে বলিতে পারিল না। তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

কথাটা বৃদ্ধ মুসলমানের অন্তরে গিয়া বাজিল। তিনি চাদর দিয়া বালকের নয়ন মুছাইয়া দিলেন; বলিলেন "দাও, তার জন্য কান্না কেন? ছেলেমানুষের পেঁপে খেলে সর্দ্দি হয়, অসুখ করে কিনা, তাই তিনি ফেরত দিতে বলেছেন। চল সন্ধ্যা হ'য়ে গি'য়েছে, তোমাকে বাড়ী দিয়ে আসি।"

ললিত নির্ব্বাক হইয়া আজিমের পিতার মুখের দিকে একবার নিরীক্ষণ করিল। দেখিল সেখানে রাগ বা অভিমানের কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। বালক যখন বাড়ী পৌঁছিল, বৃদ্ধ তখন হৃদয়ের আবেগ আর রুদ্ধ করিতে পারিল না। নয়ন-জল মুছিতে মুছিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তাহার পরদিন হইতে আজিমের মধ্যে যেন একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। সে ক্লাসে কেমন যেন উদাসভাবে, শূন্যদৃষ্টিতে ললিতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত তাহার বড় বড় চক্ষু দুটি ছল ছল করিত, কিন্তু কি জানি কেন সে কোন কথা কহিত না। ললিতও নিজের মধ্যে একটা একান্ত অভাব অনুভব করিত; সুতরাং মাথা তুলিয়া আজিমের দিকে চাহিতে পারিত না,—যেন তাহার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। আজিমের লেখাপড়ায় সহসা অনুরাগ বাড়িয়া উঠিল, সে বিশেষ করিয়া পড়াশুনায় মন দিল। ললিতের পিতা অল্পদিন পরে ললিতকে তাহার মাতুলালয় কলিকাতায় পড়িতে পাঠাইলেন।

(৩)

তাহার পর পনের বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রামের অনেক পুরাতন বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। তাহাদের

স্থানে সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া গ্রামের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অনেক বৃদ্ধ নরনারী সংসারের খেলা সাঙ্গ করিয়া পরপারে পাড়ি দিয়াছে; কিন্তু ললিতের পিতা শিবশঙ্করবাবু শুভ্রকেশে, কোটরগত নয়নে ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া এখনও দাওয়ায় বসিয়া তামাক সেবন করেন। ললিতের শিশুপুত্রটী তাঁহার ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া পাকাচুলের ভিতর হইতে কাল চুল আবিস্কার করিয়া দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা লাভ করে। সুরকী রংয়ের কুকুরটা জীর্ণশীর্ণ লোলচর্ম্ম হইয়াছে, তথাপি তাহার দৃষ্টিশক্তির কোন প্রকার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় না। সে প্রতিদিন উঠানে পড়িয়া নিদ্রা যায়। শান্তি এখন বড় হইয়াছে; কিন্তু ছেলে-বুদ্ধি আজও যায় নাই, মাঝে মাঝে পাখীটা আসটা ধরিয়া আনে।

ললিত কলিকাতায় একটী আপিসে কর্ম্ম করে। মাসিক পঁয়ত্রিশটী টাকা আয়, তাহাতেই কোন রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

আপিসে কর্ম্মোপলক্ষে ললিতকে সাহেবদের সংস্পর্শে ও সংস্রবে আসিতে হয়। তখন মাঝে মাঝে তাহার সেই অতীতের কথা স্মরণ হয়। মুসলমান বালকবন্ধু আজিমের সহিত মেলামেশার জন্য তাহাকে পিতার নিকট কি নিদারুণ তিরস্কারই না সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু আজ আর কোন বাধা নাই, আপত্তি নাই, অভিমান নাই! সকলই সময়ের গতি! আজিমের সহিত ললিতের বন্ধুত্বভাব মনে মনে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই—ললিতের হৃদয়ে বন্ধুত্বের সিংহাসনখানি আজিমের জন্য আজিও শূন্য পড়িয়া আছে।

পূজার ছুটিতে ললিত বাড়ী আসিয়াছে। পূজা উপলক্ষে অনেকেই দেশে আসিয়াছে। বিজয়ার দিন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা পরস্পরকে স্নেহাশীষ, অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যবদনে কুশল-সম্ভাষণ

করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সময় আজিমও ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছে। সে দিন সে বাজারের পথ দিয়া যাইতেছিল, সহসা ললিতের দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইলে সে ডাকিল "আজিম!"

আজিম সে কথা শুনিতে পাইল কি না জানি না, তবে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে যেন সে ললিতের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইল।

ললিতের মনের মধ্যে এক নিমিষে অতীতের সকল কথা তড়িৎ-প্রবাহের মত সঞ্চারিত হইয়া, হৃদয় স্পন্দিত হইল। অজ্ঞাত ব্যাধির ন্যায় তাহার বেদনা-পীড়িত অন্তর বিদীর্ণ করিয়া সহসা নয়নে অশ্রু প্রকাশ পাইল। সে যেন কেমন একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। তখন কেবলই মনে হইতেছিল, আজিম নিশ্চয়ই পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ করিয়া তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিল, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গেল।

শত্রুমিত্র সকলে সকলকে আজ বক্ষে ধারণ করিয়া শান্তি ও সুখ অনুভব করিতেছে। ললিতের মনে হইল, এমন দিন, হিন্দুর বৎসরে এক দিন—এমন মিলন-উৎসব হিন্দুর বৎসরে বিশ্ব-জননীর করুণায় এক দিন মাত্র আসে। সে সেই পুণ্যপবিত্র মিলনকে বিশ্বের সহিত যোগ করিয়া বাঁধিতে পারে, তাহাকেই বিশ্বজননী সাদরে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লন। এমন দিনে সে যদি আজিমকে একবার বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পাইত, তবেই তাহার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হইত। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ললিত গৃহে ফিরিল। চারিদিক হইতে যেন একটা অশান্তি প্রতিকার-লালসায় তাহার অনুসরণ করিতেছিল। আজিমকে দেখিবার পর হইতে তাহার শরীর কেমন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সেই রাত্রিতে তাহার অত্যন্ত

জ্বর হইল। জ্বর দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের যোগীন ডাক্তার দুই তিন শিশি ঔষধ প্রদান করিল; কিন্তু তাহাতে কোন উপকার দর্শিল না; বরং নানা প্রকার উপসর্গ আসিয়া দেখা দিল।

বিজয়ার দিন জ্বর হইয়াছে; অমন শুভদিনে জ্বর হইল? মেয়েদের মনে হইতেছিল—সে দিনটা যে বিসর্জ্জনের দিন! বাড়ীসুদ্ধ সকলে শঙ্কিত হইল। বৃদ্ধ শিবশঙ্করের মুখ শুকাইয়া গেল। অদৃষ্ট ভাবিয়া বেচারী ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিল।

শরতের নির্মেঘ আকাশে, দুই একখানি মাত্র ক্ষুদ্র সাদা খণ্ডমেঘ উল্লাসে দূর দূরান্তরে পাড়ি দিতেছে। শারদীয়া পূজার পর কোজাগর লক্ষ্মীপূজার ঢোল গ্রামের প্রান্তে বসুদের বাড়ী তুমুল সংগ্রামের পর ক্ষুদ্র যুদ্ধের সূচনা করিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় চাদর জড়াইয়া খালি পায়ে মুরুব্বি সাজিয়া গলা ধরাধরি করিয়া জটলা পাকাইতে পাকাইতে পল্লীপথে চলিয়াছে। কোনখানে বৃদ্ধারা উঠানে বসিয়া নারিকেল ছুলিতেছে—আজ চিপিটকের সহিত নারিকেলের অপূর্ব্ব সম্মিলন।

এই সময় ললিতের বড়ছেলে শুষ্কমুখে একটী শিশি হাতে ডাক্তারের বাড়ী ঔষধ আনিতে যাইতেছিল। পথে তাহাকে দেখিয়া আজিমউদ্দিন জিজ্ঞাসা করিল "খোকা, তোমার বাবা কেমন আছে?"

"বাবা ভাল আছেন, কিন্তু কাল থেকে কথা কন না।"

আজিম চমকিয়া উঠিল; বলিল "আমি আজ তোমার বাবাকে দেখ্‌তে যাব। তোমার দাদামশাইকে ব'লো"।

আজিমকে যে দিন আজিমের পিতা ললিতের সহিত কথা কহিতে

নিষেধ করিয়া দেন, এবং তাহার কারণ বুঝাইয়া বলেন, সেই দিন হইতে সে মনে মনে স্থিরসংকল্প করিল, "লেখা পড়া শিখিয়া ডাক্তার হ'ব, সকল জাতির উপকার ক'র্ত্তে পারব। মুসলমান ব'লে কেহ তখন ঘৃণা কর্‌তে পার্‌বে না।"

আজিমের সে সাধনা আজ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সে আজ কোম্পানীর হাঁসপাতালের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার—সর্ব্বজাতি-নির্ব্বিশেষে সে সকলকে সমান চক্ষে দেখে এবং সকলেও একবাক্যে তাহার ভদ্রব্যবহারের সুখ্যাতি করে।

এক মাসের ছুটি লইয়া আজিম বাড়ী আসিয়াছে। যতবার সে ললিতের সঙ্গে দেখা করিবে মনে করিয়াছে, ততবারই তাহার মনে আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে, পাছে—ললিত এখন বড় হইয়া জাতীয়-গৌরবে তাহাকে মুসলমান জ্ঞানে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে ঘৃণা করে। তাহা হইলে আজিমের যে সব ব্যর্থ হইবে, সে উপেক্ষা যে তাহার মর্ম্মান্তিক হইবে! সে হিন্দুর সকল বাধা, সকল সঙ্কোচ নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে প্রস্তুত; কিন্তু একটী সামান্য অবজ্ঞার পরিচয় ললিতের নিকট হইতে আসিলে আজ তাহার জীবন-নাট্য অন্য প্রকার অভিনীত হইবে। সে মনে মনে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিল,—কিন্তু যখন তাহার কর্ণে বালকের করুণ কথাগুলি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"বাবা ভাল আছেন, কিন্তু কা'ল থেকে কথা কন না" তখন গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের পুঁজি তাহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আজ সে আর কোনমতে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

আজিম অত্যন্ত ভয়বিহ্বলচিত্তে ললিতদের গৃহের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। শিবশঙ্করবাবু তখন নীরবে পুত্রের আসন্ন-বিপদের কথা চিন্তা করিল,

নিজের বৃদ্ধাবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্রুমোচন করিতে-ছিল। আজিম মৃদুকণ্ঠে ডাকিল "খুড়াঠাকুর!" এই সম্বোধন করার পর যেন তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

"কে ও।"

"আজ্ঞে, আমি আজিম।"

"এস্ এস্, কবে বাড়ী এলে?"

"আজ সাত আটদিন; কেমন আছেন?"

শিবশঙ্কর জানিতেন আজিম পাসকরা ডাক্তার হইয়াছে। বৃদ্ধের বুক হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আমিই একদিন আজিমের পেঁপে ফেরত দিতে হুকুম জারি করিয়াছি, মুসলমান আজিমের সহিত ললিতের কোনও সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না একথাও একদিন বলিয়াছি; কিন্তু লেখাপড়ার এমনই গুণ, আজিম সে সকল কথা মনে রাখে নাই। আজিমকে এই বিপদের সময় পাইয়া বৃদ্ধের হৃদয় অনন্দে উদ্বেলিত হইতেছিল; কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না।

আজিম সঙ্কোচের সহিত বলিল "যদি আজ্ঞা করেন ত—"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিলেন "হ্যাঁ হ্যাঁ এস্ দেখ্‌বে বৈ কি!"

আজিম রোগীর গৃহের নিকট গিয়া জুতা খুলিয়া বাহিরে রাখিল, পরে অত্যন্ত সঙ্কোচে গৃহে প্রবেশ করিল। রোগীর শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের মুখের প্রতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল "এ শয্যা স্পর্শ করিতে পারি?"

বৃদ্ধ বলিলেন "দেখ বাবা, ভাল ক'রে দেখ; বুকটুক্-গুলা পরীক্ষা ক'রে দেখ কোন ভয় আছে কিনা!"

আজিম আজ বহুদিন পরে স্নেহপূর্ণকণ্ঠে ডাকিল "ললিত, কেমন আছ?"

ললিত ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল, আজিমের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর তাহার ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কম্পিত হইতে লাগিল, সে কোন কথা বলিতে পারিল না। আজিম যখন ষ্টেথস্‌কোপ দ্বারা তাহার বক্ষ পরীক্ষা করিতেছিল, তখন ললিত দুই শীর্ণবাহু দিয়া বন্ধুর কণ্ঠ জড়াইয়া বক্ষের উপর টানিয়া "বলিল আজিম, তুমি ভাগ্যিস ডাক্তার হয়েছিলে ভাই।"

আজিম জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ?"

"এখন খুব ভাল আছি—"

"কি খেতে ইচ্ছা করে?"

"তোমাদের গাছের পেঁপে"—

আজিম কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইল। বৃদ্ধের নয়ন দিয়া—দর দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন "আজিম, তোমাদের গাছে পেঁপে এখন আছে কি?"

"আমি নিয়ে আস্‌চি, আপনাকে কষ্ট ক'রে যেতে হ'বে না!"

"কেমন দেখ্‌লে?"

"ভাল। দুই দিনে সেরে যাবে। ঠিক ঔষধ পড়ে নাই ব'লে জ্বর কিছু বেশী হয়েছে।" বৃদ্ধ বলিলেন "বাবা তুমি নিজ হাতে ঔষধ ক'রে নিয়ে এস, সঙ্কোচ করো না।"

ললিত বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। আজিম আরও পনর দিনের ছুটী বাড়াইয়া লইয়াছে। এখন দুই বন্ধু একত্র বসিয়া বহুদিনের সঞ্চিত কথাবার্ত্তায় দিন কাটায়।

শিবশঙ্করবাবু লোকের নিকট গোঁড়ামীর ঝোঁকে ও সংস্কারবশে বলিয়া বেড়ান "আতুরে নিয়ম নাস্তি।"

স্মৃতি-চিত্র।

সন্তোষকে বিলাত পাঠাইয়া চারুবাবু কল্যাণী-নির্দ্দিষ্ট 'হতচ্ছাড়া,' ঘরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাড়ীর মধ্যে চারুবাবুর এটী নিজস্ব কক্ষ। সেখানে বসিয়া তিনি চিত্র আঁকেন। ঘরটি তাঁর বড় আদরের।

চারুবাবুর স্ত্রী কল্যাণী প্রথম প্রথম ঘরটার উপর হাড়ে চটিয়াছিলেন। কতদিন মধ্যাহ্নে তাঁহাকে এই ঘরের দ্বারের নিকট স্বামীর বহিরাগমনের জন্য মাথা কুটাকুটী করিতে হইত। বেলা দ্বিপ্রহরেও চারুবাবুর স্নানাহারের কথা মনে থাকিত না। তিনি একবার এই যাদুঘরে প্রবেশ করিলে জগৎসংসার বিস্মৃত হইতেন। কল্যাণী মনে মনে বলিতেন ঐ ঘরের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কুহক-মন্ত্র আছে, যাহা মানুষকে যাদু করিয়া রাখে। এই নিমিত্ত কল্যাণী রাগে, অভিমানে গৃহটির নাম দিয়াছিলেন "হতচ্ছাড়া ঘর।"

সন্তোষের বিলাত-গমনের পর হইতেই চারুবাবু প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া সেই "হতচ্ছাড়া' ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেন; আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত কল্যাণীর অনুনয় বিনয় তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া সেখান হইতে বাহিরে তাড়াইয়া না আনিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন মতেই চারুবাবু সে গৃহ পরিত্যাগ করিতেন না।

কল্যাণী জানিতেন তাঁহার স্বামী একজন চিত্রবিৎ; কিন্তু তথাপি তিনি কোন দিন কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া সে ঘরে প্রবেশ করেন

নাই; কারণ সেই ঘরটীর দিকে চাহিলেই তিনি যেন সপত্নীর জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিতেন; ইহার উপর চারুবাবু কাহাকেও সে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

যৌবনের আরম্ভে, যে বৎসর সন্তোষ আসিয়া সংসার-বন্ধনের প্রেম-সূত্রটিকে নবদম্পতির মধ্যে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দিল—সেই বৎসর হইতে চারুবাবুর সে গৃহের দিকে টান অল্প ঢিলা পড়িল। নবজাত শিশু সন্তোষ কচি কচি ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া হাসিয়া যখন চারুবাবুকে আটক করিতে আরম্ভ করিল, তখন কল্যাণী আহ্লাদে পুত্রকে দোলায় শয়ন করাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া স্বামীর কয়েদীর অবস্থাটা অবলোকন করিয়া সুখী হইতেন, হাসিতেন, পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া গৃহ হইতে পালাইতেন, আর সেই নির্ব্বাক নীরব গৃহটির প্রতি চাহিয়া তীব্র উপহাস করিতেন।

কিন্তু সুযোগ পাইলেই চারুবাবু সেই গৃহটির মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতেন। তখন বাহিরের আর কিছুই তাঁহার মনে থাকিত না। এই গৃহটি তাঁহার নিকট বিশ্বরাজ্যের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে হইত। বাহিরের শত কোলাহল, চীৎকার, হাসি-কান্না সেই গৃহের দ্বার অতিক্রম করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। সকল বন্ধন যেন বাহিরে রাখিয়া চারুবাবু সেই ঘরে প্রবেশ করিতেন।

সমস্ত দিন একাকী এই গৃহের মধ্যে থাকিয়া, যখন সন্ধ্যার পূর্ব্বে চারুবাবু বাহিরে আসিতেন, তখন তাঁহার মুখের উপর প্রসন্নতার পবিত্র রেখাগুলি ফুটিয়া উঠিত। সফলতার সার্থকতায় যেন তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। অলসের অবসন্নতা সে পথে কোন দিনই দেখা যাইত না। ঐ গৃহটি যেন তাঁহার পূজা-গৃহ বলিয়া মনে হইত। ঐ গৃহাভ্যন্তরে যেন পুণ্য, পবিত্রতা, শান্তি, সুখ, ঐশ্বর্য্য একাধারে

অবস্থান করিত। পারিবারিক কোনরূপ বিশৃঙ্খলা যদি দেখা যাইত এবং সে জন্য যদি কখনও চারুবাবুর মুখমণ্ডল অল্প চিন্তাক্লিষ্ট বলিয়া অনুমিত হইত, তবে সকলে ভাবিত আজ নিশ্চয় ঐ পূজা-গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয় নাই।

সরল, শান্ত, মিষ্টভাষী চারুবাবুর বুঝি এ জগতে, এই গৃহটির মত আপনার নিজের বলিতে আর কিছু পরিলক্ষিত হইত না। আনন্দ, উৎসাহ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সব তার ঐ গৃহের অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যেই নিহিত ছিল।

ঐ গৃহের চাবী তিনি নিজ হস্তে বন্ধ করিতেন ও খুলিতেন। সকলের প্রতি তাঁহার এই কঠোর আজ্ঞা প্রচার ছিল, যেন কেহ তাহার বিনা অনুমতিতে সে গৃহে প্রবেশ না করে।

কোন কোন দিন দেখা যাইত, চারুবাবু ঐ কক্ষ হইতে হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিতেছেন, কল্যাণী আসিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আজ দেখছি, বড় আনন্দ, কিছু লাভ হ'য়েছে না কি?"

"লাভ না হ'লে কি স্বার্থপর মানুষ কোন দিন নিঃস্বার্থভাবে হাস্‌তে পারে? আজ আমার জীবনে একটা অমূল্য রত্ন লাভ হয়েছে—তার তুলনা হয় না।"

"কি বল না? আমাকে বল্‌বে না?"

"অমূল্য জিনিস লাভ হ'লে কি বল্‌তে আছে? হয় ত কেউ শুন্‌তে পাবে, আর চুরি ক'রে নিয়ে যাবে?"

"এত টাকাকড়ি, সোনা-দানা ছড়ান র'য়েছে কেউ একটা কুটা পর্য্যন্ত নেয় না, আর সেই অদৃশ্য অমূল্য দ্রব্যটা চুরি করে নেবে, এ কেমন কথা বুঝি না।"

"বোঝ না বলিয়াই ত বলি না।"

কল্যাণীর ইহাতে বেশ একটু অভিমান হইল। তিনি বলিলেন—"বুঝি না যখন, তখন বলিতে হইবে না, আমি শুনিতে চাই না। তোমার অমূল্য জিনিস তোমারই থাক্, আমার কাজ নাই।"

কল্যাণীর অভিমান-আরক্তিম বদন, ভ্রূকুটী-কুঞ্চিত ললাট চারুবাবুর নিকট বেশ একখানি অনুরাগ-দীপ্ত স্নেহকোমল প্রেম-চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তিনি অনিমেষ-নয়নে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নিশ্চল দৃষ্টিতে কল্যাণীর মুখের ভাবান্তর ঘটিল, তিনি লজ্জাভিভূতা হইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, চারুবাবু সস্নেহে তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"আমার অমূল্য জিনিস তোমাকে দেখাইব—বল তাহ'লে রাগ করবে না?"

"আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।"

"কেন? একটু পূর্ব্বে এত আগ্রহ, আর এক মুহূর্ত্তে বৈরাগ্য—এটা ভাল নয়।"

"অত শত বুঝি না, যাহা দেখিতে নাই, তাহা দেখিতে চাই না।"

চারুবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমার জীবনের অমূল্য লাভ কি জান?" বলিয়া আগ্রহে কল্যাণীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন—"তুমি।"

ইহাতে কল্যাণীর মুখখানি লজ্জারুণ হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন "যাও!"

চারুবাবু সহাস্যে উত্তর করিলেন—"কোথায় যাব, আমার অমূল্য লাভ ফেলিয়া কি নড়িতে পারি।"

কল্যাণী স্বামীর স্নেহপীড়ন হইতে সোহাগ-দৌরাত্ম্যে হাতখানি মুক্ত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইলে বরং প্রেমাভিনয়টা আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

চারুবাবু আগ্রহে তাঁহার অভিমান-রোষদীপ্ত ওষ্ঠদ্বয় অনুরাগ-চুম্বনে অনুরঞ্জিত করিয়া দিলেন।

এইরূপ প্রেমাভিনয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন সুখের আদর্শচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন সকালে দোলায় শুইয়া সন্তোষ বেজায় খেলা সুরু করিল। যেমন কল্যাণীর দৃষ্টি শিশুর নয়নের উপর পড়ে, অমনই সে হাসিয়া অধীর হইয়া উঠে। এত হাসি, এত খেলা সেদিন যেন কল্যাণীকে বড় মধুর লাগিল। তিনি তখন উল্লাসে, স্বামীকে খুঁজিতে এ ঘর সে ঘর করিলেন। কোথাও তাঁহার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে সেই নিষেধ-নির্দ্দিষ্ট গৃহটির ভিতর গিয়া হাজির হইলেন।

সেখানে কল্যাণী যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বাক্‌স্ফূরণ হইল না। স্বামী যোগমগ্ন তপস্বীর ন্যায় ধ্যান-নিবিষ্টচিত্তে তুলিকাহস্তে এক-খানি অর্দ্ধ-অঙ্কিত চিত্রের প্রতি অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া আছেন। তুলিকাটি অর্দ্ধোত্তোলিত অবস্থায় চিত্রের উপর রেখাপাত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সম্মুখে নানা বর্ণের রং গোলা রহিয়াছে। কোনটীর সহিত তুলিকার এখনও সংস্পর্শ মোটেই হয় নাই—কোন রংটি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে।

কল্যাণীর আগমন চারুবাবু বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রূ কখন ঈষৎ কুঞ্চিত হইতেছে, কখন মুখের উপর প্রসন্নতার পবিত্র জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি আপনা-আপনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, কখন বা গ্রীবা বাঁকাইয়া অঙ্কিত চিত্রের উপর নিবিড়ভাবে মনঃসংযোগ করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন।

যে চিত্রখানি আঁকিতেছেন, সেখানি একটী সুন্দরী যুবতীর। যুবতীর

সম্মুখে একজন যুবক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চিত্রকর চিত্রে যুবকের অবস্থানটি এত মধুর ও প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিয়াছেন যে, যুবকের মুখখানি চিত্রমধ্যে সম্পূর্ণ না দেখাইয়া, তাহার শরীরের গঠন-কৌশলের ভিতর দিয়া এমন শিল্পকুশলতার সহিত রেখাসম্পাত করিয়াছেন যে, তাহাতেই একজন প্রেমিকের পরিপূর্ণ হৃদয়খানি সেই বর্ণ-সংযোজনার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। চিত্রের মূল বস্তু, লজ্জা-আরক্তিম-আনন রমণী প্রিয়বরের নিকট হইতে পলায়ন-উদ্যতা। চিত্রকর এই হৃদয়গ্রাহী প্রেমাভিনয়টি এমন কৌশলে নিপুণ তুলিকা-সাহায্যে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, চিত্রখানির দিকে তাকাইলে, অন্তরে বাহিরে প্রাণকে যেন পুলকানন্দে মাতাইয়া তোলে।

কল্যাণী নির্ব্বাক্ হইয়া অনন্যমনে সেই চিত্রখানি দেখিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল। নয়ন হইতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল,—"স্বামি! এ কি করিয়াছ, আমার মত হীন দুর্ব্বল নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া, কেন আপনার প্রতিভার মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়াছ। এ বিশ্বসংসারে আর কিছু খুঁজিয়া পাইলে না? আমি কবে তোমার উপর অভিমান করিয়াছি,—যদি কখন করিয়া থাকি—তাহা কি এমন করিয়া মনে রাখিতে হয়? যদি মনে রাখিলে, তবে কি, এমন ভাবে চিরদিনের নিমিত্ত, চিত্রের মধ্যে বন্দিনী অবস্থায় বাঁধিয়া রাখিতে হয়।"

সহসা কল্যাণীর দৃষ্টি আর একখানি চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এখানি সম্পূর্ণ চিত্র। এখানিতে কল্যাণীর দ্বিরাগমন ঘটনাটী সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। চারিদিকে বালক-বালিকারা উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, দাস-দাসীদের পুলক-উৎফুল্ল আনন! গৃহের মধ্যভাগে

আর একখানি চিত্রে চিত্রকর কল্যাণীর বধূবেশ ও মুখ-দর্শন পর্ব্বটি এত সহজ সরল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, দেখিলে বোধ হয় হিন্দু-সংসারে রীতি-নীতির মধ্য দিয়া একটী সুমহান উজ্জ্বলভাব চিত্রে ফুটিয়া রহিয়াছে। চিত্রকরের তুলিকা এখানে প্রতি রেখায় যেন এক একটী ভাবকে বর্ণসংযোগে প্রাণদান করিয়াছে।

কল্যাণীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহার স্বামী যে একজন নিপুণ চিত্রকর, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি ভাবিলেন, কেন তিনি এতদিন আমার জন্য তাঁহার অমূল্য সময়, বিপুল পরিশ্রম এই সকল চিত্র অঙ্কনে অপব্যয় করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা ত অনেক ভাল চিত্র তিনি অঙ্কিত করিতে পারিতেন, তাহাতে এক দিন জগতের নিকট মহীয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন।

গৃহমধ্যস্থিত সমস্ত চিত্রাবলীই কল্যাণীর বিবাহের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি অবলম্বনে নানাভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। কল্যাণী যতই চিত্রগুলি দেখিতেছিলেন, ততই যেন লজ্জা ও সঙ্কোচ-অভিভূতা হইয়া পড়িতেছিলেন। এমন সময় অর্দ্ধোত্তোলিত তুলিকা ক্রমে ক্রমে চিত্রের উপর নত হইয়া একটী সূক্ষ্ম রেখা টানিয়া দিল। এই একটী সূক্ষ্ম রেখাতে রমণীর নয়নের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যেখানে পূর্ব্বে অল্প চাঞ্চল্যের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেখানে লজ্জার কমনীয় রাগ জাগিয়া উঠিল। কল্যাণী অমনই বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ বেশ ত!" তারপর লজ্জায় তাঁহার মুখ রাঙ্গা হইয়া গেল, তিনি চক্ষু নত করিলেন—আর চিত্রের প্রতি তাকাইতে সমর্থ হইলেন না।

চারুবাবু তুলিকা রাখিয়া উঠিলেন, ধীরে ধীরে আসিয়া কল্যাণীর

হস্তধারণ করিলেন; বলিলেন—"কল্যাণী, আমার জীবনের অমূল্য লাভ কি, সে দিন আমার কথায় শুনিয়াছিলে মাত্র, আজ স্বচক্ষে দেখিলে।" কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

ইহার পর হইতে কল্যাণী প্রতিদিন মধ্যাহ্নে এই চিত্রশালায় আসিয়া বসিতেন, স্বামীর কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। কোন কোন দিন হয় ত চারুবাবু বলিতেন—"কল্যাণী ঐ লাল রংটার সহিত হল্‌দেটা মেশাও ত।" কল্যাণী আগ্রহ ও উৎসাহভরে তখনই সে আদেশ পালন করিতেন—কোন দিন হয় ত বা চারুবাবু দূরে দাঁড়াইয়া অঙ্কিত অংশের দোষ গুণ পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সহসা বলিয়া উঠিতেন—"কল্যাণী ঐ অধরের নীচে একটু গোলাপী রং দাও ত।" কল্যাণী উৎসাহভরে তুলিকা উঠাইয়া লইতেন ও নিপুণ শিল্পীর মত তুলিকাপাত করিতেন। এই প্রকারে কল্যাণী তাঁহার নিজের ও স্বামীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এই সুকুমার কলাবিদ্যার মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অনেক সময় ফিকে লাল রং দিবার অনুমতি পাইয়া কল্যাণী গাঢ় রাঙ্গা দিয়া বাহাদুরী গ্রহণ করিতেন। চারুবাবু মৃদু হাসিয়া বলিতেন—"এ যে দেখ্‌ছি দিন দিন শিষ্যা গুরুকে ছাপিয়ে উঠ্‌ছে।" কল্যাণী অমনই লজ্জায় তুলিকা ফেলিয়া পলাইতে উদ্যত হইতেন। কিছুদিনের ভিতর কল্যাণীর চিত্রকলার উপর যেমন অনুরাগ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু জ্ঞানসঞ্চার যে না হইল, তাহা বলিতে পারি না।

এই সময় সন্তোষ বড় হইয়া উঠিল; সুতরাং কল্যাণীও বড় একটা সে গৃহে যাইতেন না—এরূপ আচরণ তখন ছেলেখেলা বলিয়া মনে মনে বড় লজ্জা হইত। কখন কখন তিনি অতীত ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া

লজ্জায় মরিয়া যাইতেন ; এখন ভুলিয়াও তিনি আর ঐ গৃহের দিক দিয়া যাইতেন না।

ইহার কয়েক বৎসর পরেই সন্তোষ বি, এ পাস করিল। তাহাকে বিলাত পাঠাইবার কথা যখন উঠিল, তখন চারুবাবু মাথা নাড়িলেন, বলিলেন—"একমাত্র পুত্র, ছেলেমানুষ, ওকে কোথায় পাঠাইব ?" কল্যাণী তাহাতে যে সায় না দিলেন, তাহা নহে। তিনিও বলিলেন—"হ'তেই পারে না।" কিন্তু সন্তোষ বড় পীড়াপীড়ি সুরু করিল। তাহার এক সহপাঠী সেই বৎসর বিলাত যাইতেছে। এক সঙ্গে এক জায়গায় থাকিবে। অবশেষে সন্তোষের বিলাত যাওয়াই স্থির হইয়া গেল। চারুবাবু যতদূর সম্ভব 'গোছগাছ' করিয়া পুত্রকে বিলাত-যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। পুত্র নির্দ্দিষ্ট দিনে বিলাত যাত্রা করিল।

সন্তোষের বিলাত যাইবার প্রায় দুই বৎসর পরেই বিশ্বনিয়ন্তা এই শান্তিময় সংসারে যে আদর্শ দম্পতীর চিত্র অদৃশ্য বর্ণতুলিকায় অঙ্কিত করিয়া লোকচক্ষুর সমক্ষে উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত করিতেছিলেন, সহসা অসমাপ্ত অবস্থায় তাহার এক অংশ মুছিয়া ফেলিলেন। কল্যাণী বিধবা হইলেন। সেই বৎসর সন্তোষের বিলাতে পরীক্ষা।

(২)

সন্তোষ যখন বিলাত যায়, তখন তাহার পিতা চারুবাবু বর্ত্তমান ছিলেন। সেই ছল ছল নেত্রে বিদায়-সম্ভাষণ ব্যাপারটি আজও সন্তোষের মনে সম্পূর্ণ জাগিয়া আছে—সেই মিষ্ট মিষ্ট কথায় "দেখিও বাবা, বুড়াবাপ, মায়ের কথা বিলাতে বিলাসিতার বিপুল বন্যার আবর্ত্তে পড়িয়া যেন ভুলিয়া যাইওনা। আপনাকে বেশ সংযত রাখিয়া লেখা-পড়া করিও"—তারপর গাড়ীর সময় হইয়া আসিল, গাড়ী ছাড়িয়া গেল—চারুবাবু অনিমেষনয়নে যতক্ষণ

পর্য্যন্ত গাড়ী দেখা গেল ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়াছিলেন। সেই স্নেহকরুণ দৃশ্যটি যেন সন্তোষের মনে থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিত। প্রবাসে পঠদ্দশায় কত দিন সে পিতার উপদেশগুলি মনে মনে আলোচনা করিত। কতদিন বসিয়া সঙ্কল্প করিত, এবার সে বাড়ী গিয়াই পিতার গৃহখানি খুব মনোমত করিয়া সাজাইবে; কারণ চারুবাবু বিপুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইলেও সাজসরঞ্জামের প্রতি তাঁহার তেমন লক্ষ্য ছিল না। কোন্‌খানে কোন্ দ্রব্যটি রাখিলে সুন্দর দেখাইবে, কোন্‌খানে কোন্ ছবিখানি টাঙ্গাইলে শোভন হইবে, এই সকল কল্পনা লইয়া তাহার প্রবাসের দীর্ঘ দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইত।

পরীক্ষা দিবার পর সন্তোষ অনেকগুলি ছবি এবং চিত্র আঁকিবার সরঞ্জাম, রং, তুলি প্রভৃতি কিনিল। সেখানে পরীক্ষার ফল যেদিন বাহির হইল, তাহার পরের মেলেই সে দেশে যাত্রা করিল।

সন্তোষ কলিকাতা আসিয়া আরও কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিল, উৎসাহ ও আনন্দ-পরিপূর্ণ অন্তরে সে গৃহে চলিয়াছে—আজ দুই বৎসর জনকজননীর স্নেহাদর হইতে সে বঞ্চিত। কেবলই মনে হইতেছে, আজ কতক্ষণে সে তাঁহাদের দেখিবে, কতক্ষণে সে গিয়া মায়ের কক্ষে বসিয়া গল্প করিবে, কতক্ষণে সে বাড়ী গিয়া পিতাকে বিলাতের গল্প শুনাইবে এবং তাঁহার ঘরখানি মনোমত করিয়া সুসজ্জিত করিবে; কিন্তু তাহার এসব চিন্তার মধ্যে কেমন একটা অনিমিত্ত ভাবনা আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে আকুল করিতেছিল। ছয় মাস হইতে সে পিতার কোন পত্রাদি পায় নাই। সে মনে মনে ভাবিত পরীক্ষার সময় জানিয়া পিতা বোধ হয় কোন পত্রাদি দেওয়া তেমন প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই, তাই লেখেন নাই; আর আমারও বাড়ী ফিরিবার সময় হইয়া আসিতেছে।

সন্তোষকুমার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। তাহার দুঃখের সীমা রহিল না। সে সর্ব্বাগ্রে পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিল। তারপর বাড়ীঘর সুসজ্জিত করিতে আরম্ভ করিল। পিতার ঘরখানি সাজানই তাহার মূল উদ্দেশ্য; যেখানে একটু সামান্য অপরিস্কার দেখিতেছে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহা পরিচ্ছন্ন করাইতেছে। সে পিতার গৃহখানি যতদূর সম্ভব সুন্দর করিয়া সুশোভিত করিল।

সন্তোষকুমার বাড়িখানি উৎসব-গৃহের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, কোন কিছুরই অভাব নাই। এত সুখ-সমৃদ্ধির ভিতরও যেন সে শান্তি খুঁজিয়া পাইতেছিল না। যেখানে যেটি রাখিলে ভাল দেখায়, সেখানে সেটি রাখা হইয়াছে, কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা বিপুল ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে।

একদিন দুপুরবেলা সন্তোষ একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া কত কি ভাবিতেছে। অনেক সময় তাহার স্বর্গীয় পিতার কথা মনে পড়িতেছে—পিতার সদুপদেশগুলি যেন এখনও তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে; কিন্তু হায়! বড় দুঃখ যে, তাহার পিতার একখানি প্রতিকৃতি সে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট পত্র লিখিয়াছে, যদি কেহ অন্ততঃ একবারের জন্য তাহার পিতার একখানি ফটোগ্রাফ প্রদান করিতে পারে; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছে। সে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে,—সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি সাজসজ্জা চিত্রাদি তাহার চক্ষে কি বিসদৃশই দেখাইতেছে—যেন সর্ব্বত্রই একটা অপূর্ণতা! যেন সকলের ভিতর একটা অসামঞ্জস্য! যখন সে তাহার পিতৃদেবের একখানি চিত্র গৃহের মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে পারিল

না, তখন যেন এই বিপুল অর্থব্যয় তাহাকে চারিদিক হইতে বিশেষভাবে পীড়ন করিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার নয়ন হইতে অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া ঝরাইয়া পড়িত।

এমন সময় "সন্তোষ কি এ ঘরে" বলিয়া তাহার জননী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

সন্তোষ শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল, বলিল,—"কেন মা!"

"একি! তুই কাঁদছিস্?"

সন্তোষের নয়ন হইতে টপ্ টপ্ করিয়া আর দুই এক ফোঁটা অশ্রু গৃহতলে পতিত হইল; সে কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে যেন কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা কি ভাবিয়া নিরুত্তর হইল।

পুত্রকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার অন্তর আরও চিন্তিত ও ব্যথিত হইল; তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, তোর সহসা এমন কি দুঃখ উপস্থিত হ'ল যে তুই কাঁদচিস্!"

সন্তোষ মনে করিল, তাহার দুঃখের কথা যদি সে প্রকাশ করে, তবে হয় ত জননীর প্রাণে দারুণ ব্যথা দেওয়া হইবে।

কল্যাণী অঞ্চল দিয়া সস্নেহে পুত্রের নয়ন মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"বাবা তোর ত কিছুরই অভাব তিনি রেখে যান নাই, তবে এর মধ্যে এমন কি অভাব উপস্থিত হ'ল যে তোর নয়ন অশ্রু-পরিপূর্ণ? তোর চোখে জল দেখ্‌লে—আমার যে প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

সন্তোষ ধীরে ধীরে কহিলেন,—"মা, বাবা আমার কোন অভাবই রেখে যান নাই সত্য। তিনি যে অতুল ঐশ্বর্য্য রেখে গিয়েছেন, কিছু না করলেও তাতে আমার চিরজীবন সুখে চলে যাবে।"

স্বামীর স্মৃতিতে কল্যাণীর নয়ন ছল ছল করিতে লাগিল, জলভারা

ক্রান্ত মেঘের ন্যায় নয়ন বর্ষণোন্মুখ হইয়া পড়িল। তিনি তখন পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ-বিজড়িত স্বরে কহিলেন,—"তবে কেন তোর চোখে জল ?"

"মা, টাকা বা সম্পত্তি থাকিলেই যদি এ পৃথিবী হ'তে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা চলে যে'ত, তাহা হলে কি কাহারও কোন ভাবনা বা দুঃখ থাকৃত ? টাকা বা ঐশ্বর্য্য ত অনেকেরই আছে, কিন্তু পৃথিবী আনন্দ উল্লাসের পরিবর্ত্তে কেবল বিষাদ ও হাহাকারে পরিপূর্ণ কেন ? সকল অভাব যে মা টাকায় যায় না !" এবার কল্যাণী বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সঞ্চিত অশ্রু নয়ন ছাপাইয়া পুত্রের হাতের উপর পড়িল। ছেলেকে বুঝাইতে গিয়া আজ অনেক দিনের পর কল্যাণীও যেন অবুঝ হইয়া পড়িলেন, তিনি একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"সন্তোষ, ঠিক বলেছিস্, প্রাণের বেদনা টাকায় ঘুচে না।"

সন্তোষ জননীর চোখে জল দেখিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল ; ভাবিল সে বড় অন্যায় করিয়াছে। এত করিয়া না বলিলেই চলিত। তাহার দুঃখ আজ মাতার সুপ্ত-ব্যথা জাগাইয়া দিল। সে তখন নয়ন মুছিয়া, মুখে হাসি আনিয়া বলিল—"দেখ মা, আমাদের সকল আত্মীয়েরই ছবি রাখা হ'য়েছে, কেবল বাবার একখানি ছবি নাই, সেজন্য বড়ই দুঃখ হয়। শুয়ে শুয়ে তাই ভাব্‌ছিলাম।"

"ও কথাটা আমার মাঝে মাঝে মনে আসে, কিন্তু তিনি ত কখনও তাঁর কোনও ফটো তোলান নাই, বা কোন ছবিও করান নাই। তখন কি জান্‌তাম যে এমন হবে" বলিয়া তিনি অঞ্চলে নয়ন মুছিলেন।

"আচ্ছা মা, তোমার কি মনে পড়ে কোথাও তাঁর ছবি আছে ?"

"কৈ? মনে ত পড়ে না; তিনি কত লোকের ছবি আঁকলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁর নিজের ছবি একখানিও করালেন না। তাঁর স্বভাবই ঐ রকম ছিল, নিজের জন্য বড় কিছু করতেন না।"

"কোন আত্মীয়-স্বজনের নিকটও কি বাল্যকালের কোন ফটো নেই ব'লে মনে হয়?"

"কৈ, তেমন ত মনে পড়ে না, আর তিনি ত বড় কোথাও যেতেন না।" কল্যাণী মনে মনে বলিলেন, "এক জায়গায় তাঁর ফটো নয়, তৈলচিত্র নয়, সজীব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে—তাহা যে দেখাবার নয়, নইলে এখনই হৃদয় খুলিয়া দেখাইতাম।"

তারপর এ কথা সে কথায় সেদিন কাটিয়া গেল। সন্তোষের হৃদয়ে ছবির কথাটি করলগ্ন কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল।

(৪)

ফাল্গুন মাস। আজ দোলপূর্ণিমা। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আনন্দ। বালকবালিকারা পিচকারী হাতে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। হিন্দুস্থানী চাকরবাকরগুলি আবীর মাখিয়া ছোট ছোট ছেলেদের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেন আজ একটা বিপুল সংগ্রামের দিন। সর্ব্বত্র সতর্ক সাবধানতা; গোপনে ফিস্ ফিস্ কথা যুবকদিগের ভিতর চলাফেরা করিতেছে। সন্তোষ দুই মাস হইল পশ্চিম বেড়াইতে গিয়াছিল, আজ প্রভাতে বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহার মনে যেন সুখ নাই, কাজে যেন উৎসাহ নাই, কেমন একটা বিষাদের ছবি তাহার মুখের উপর ফুটিয়া রহিয়াছে, এমন সময় রামসিং একখানি থালায় করিয়া একরাশ আবীর লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ লালে লাল হইয়া গিয়াছে—পরিধেয় বস্ত্রখানি রক্তবস্ত্রের মত দেখাইতেছে, দীর্ঘ কেশ ও গুম্ফরাজির

উপর আবীর লাগিয়া এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সে থালা-খানি গৃহতলে নামাইয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আচ্ছা হ্যায় ?"

সন্তোষ এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে গৃহভিত্তিগাত্রে লম্বিত একখানি ছবি দেখিতেছিল—রামসিংয়ের কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল ; সে বলিল "রামসিং, খবর ভাল ?"

"হাঁ হুজুর।"

"তোমার থালাতে আবীর কেন ?"

"আজ ভগবানজীকো দোল" বলিয়া থালা হইতে আবীর লইয়া সন্তোষের ললাটে লেপন করিয়া দিল। সহসা সন্তোষের মনে পড়িয়া গেল, অনেকবার ঠিক এমনই দোলের দিনে রামসিং থালা ভরিয়া আবীর আনিয়া পিতার ললাটে লাগাইয়া দিত, পিতা তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন। তখন পিতার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইত। আজ যেন সন্তোষের চক্ষের সম্মুখে সেই আবীর-মাখা পিতৃমুখ ফুটিয়া উঠিল। সন্তোষ রামসিংকে পাঁচটা টাকা প্রদান করিল ; রামসিং তখন আবীরের থালাখানি হাতে লইয়া আকুল অন্তরে গৃহের সমস্ত ছবিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল, বুঝি বেচারী চারুবাবুর ছবির অন্বেষণ করিতেছিল। এই সময় কল্যাণী একখানি তৈলচিত্র হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রামসিং বলিয়া উঠিল—"মায়ি, খোকাবাবুর ঘরে সকলেরই ছবি আছে কেবল—"বলিয়া প্রভুপরায়ণ রামসিং আর বলিতে পারিল না—ভোজপুরনিবাসী বৃদ্ধ রামসিংয়ের নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কল্যাণী বলিলেন—"রামসিং, এখনও সব ছবি টাঙ্গান হয় নাই—এই তোমার বাবুর ছবি, দেখ দেখি ঠিক হ'য়েছে কি না ?"

সন্তোষ উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"কৈ মা, দেখি দেখি।"

কল্যাণী স্মৃতি হইতে অঙ্কিত স্বামীর চিত্রখানি সম্মুখের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া অশ্রু-প্লাবিত নয়নে চিত্রের উপর আবীর অর্পণ করিয়া বলিল—"মায়ি, দেখ, দেখ, বাবু যেন আমার আবীর পেয়ে হাস্‌ছেন্; মনে হচ্ছে যেন বাবু ঘরেই রয়েছেন।"

সন্তোষ আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া বলিল—"বিলাতে ও দেশে অনেক ভাল ভাল চিত্র দেখেছি, কিন্তু এমন সজীব-চিত্র কোথাও কোন দিন দেখি নাই মা! এ ছবিখানি কোথায় পেলে?"

"সন্তোষ, সে দিন তোর কান্না দেখে আমার হৃদয়ের প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতার অনুরূপ মূর্ত্তি তুলিকায় এঁকে এনেছি" বলিয়া কল্যাণী গলায় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া, দোলপূর্ণিমার দিন ভক্তিভরে স্মৃতি-চিত্রের পাদমূলে প্রণাম করিলেন। আনন্দে বৃদ্ধ রামসিংয়ের হস্ত হইতে আবীরের থালাখানি গৃহতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে আবীর ছড়াইয়া গৃহখানি যেন উল্লাস-উৎসাহে রাঙ্গা হইয়া গেল।

প্রজাপতির পরিহাস।
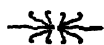
(১)

মাঘ মাসের শেষ। পাঞ্জাবে তখনও খুব শীত। বিদুষী সুন্দরী রমাবাই গাড়ির ভিতর মুড়ি সুড়ি দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি একজন ধনীর কন্যা—কুমারী।

তখন পাঞ্জাব অঞ্চলে একটী দেশী ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। দেশবাসীরা উহার নামকরণ করিয়াছে "Poor Bank" বা দরিদ্রের ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কে বিদুষী রমা তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর নিজের সমস্ত টাকা জমা রাখিয়াছেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার রমেশবাবু একজন খুব কাজের লোক। রমেশ-বাবুর সুখ্যাতি ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় অল্পদিনেই পাঞ্জাবের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পাঞ্জাবীরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিত।

রমা প্রায়ই স্বয়ং ব্যাঙ্কে যাইতেন। নিজেদের দরিদ্রের ব্যাঙ্ক মনে করিতে উল্লাসে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। ম্যানেজার রমাকে অত্যন্ত সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। সময় সময় অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের উন্নতির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিত।

সে দিন গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া রমার মনে হইতেছিল—ম্যানেজার লোকটী বড় মিষ্টভাষী, সদালাপী ও বিশ্বাসী। তাহার উপর লোকটীর

মোটেই অহঙ্কার নাই। ব্যাঙ্কের উন্নতিকল্পে তিনি দিন রাত খাটেন। দরিদ্রের ব্যাঙ্ক যাঁহাকে চালাইতে হইবে, তাঁহার এরূপই হওয়া উচিত। সকলের সহিত তাঁহার আলাপ। সকলকেই তিনি চেনেন, সকলেও তাঁহাকে চেনে। তারপর কি একটী কথা সহসা রমার মনে উদয় হইতেই তাঁহার মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনে হইল পথের জনসঙ্ঘ তাঁহার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছে; যেন আজ বিশ্বের সকল দৃষ্টি এমন একটী বরলাভ করিয়াছে যে, নারী-হৃদয়ের-অন্তঃস্তলটা পর্য্যন্ত সে দৃষ্টির নিকট ধরা পড়িতেছে। এই সময় সহিসের কোন একটী কথায় কোচম্যান হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমনই বিদুষী রমার বক্ষ কাঁপিল। ছিঃ! এরাও কি আমার কল্পনা জানিতে পারিয়াছে? আচ্ছা, কিরূপে মানুষগুলো পরের মনের কথা এমন করিয়া জানিতে পারে? পরের লুকান কথা জানা যে পাপ বা অন্যায়, তাহা কি উহারা বোঝে না? নাই বুঝুক, তাতেই বা ক্ষতি কি! বাঙ্গালী? তাহাতেই কি হইয়াছে? ওই ত সমাজের দোষ, সঙ্কীর্ণতা! তারপর তাঁহার অধরপ্রান্তে জ্যোৎস্নার মত একটু স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। নয়ন আনন্দ-উল্লাসে উজ্জ্বল দেখাইল। রমার মনে হইল, যদি তিনি রমেশবাবুর সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন, তবে রমেশবাবুর পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইতে পারে! কিন্তু লোকটা বিপরীত রকম মোটা, অত মোটা হওয়া কিন্তু ভাল নয়। পূর্ব্বে ত তিনি এত অমানানসই মোটা ছিলেন না। বাঙ্গালার লোক এ দেশে আসিলে কেমন খুব শীঘ্রই মোটা হইয়া পড়ে! ভাবিতে ভাবিতে স্মরণ হইল তাহার মুখখানাও যেন বড় বে-মানান। এমন সময় গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দ্বারে থামিল। সহিস আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিল, আদর করিয়া অশ্বের পৃষ্ঠদেশে দুই

একটী চাপেটাঘাত করিল। এই সময় লণ্ঠনের বাতি অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া তখনই সহসা নির্ব্বাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে রমার চমক্ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন পাশ বইখানি আনিয়াছেন কি না। রমা সে দিন দশ-হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছিলেন।

(২)

পরদিন রমেশবাবু আফিসে আসিলেন না। কোন সংবাদও পাঠান নাই। সন্ধ্যার সময় ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা তাঁহার খবর লইতে তাঁহার বাড়ী গেলেন। সেখানে তাঁহারা শুনিলেন, গত রজনীতে রমেশবাবু বাড়ীর বাহির হইয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত ফেরেন নাই। পরদিনও রমেশ-বাবুর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। ডিরেক্টারদিগের নিকটে এ সংবাদ প্রেরণ করা হইল। সেই দিনই একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইলে কর্ম্মচারী, ধনাধ্যক্ষ সকলেই সমস্ত দিন খাতাপত্তর লইয়া ছুটাছুটি করিল। পরদিন দৈনিকসংবাদপত্রে প্রকাশ হইল "Poor Bank র ম্যানেজার রমেশবাবু ব্যাঙ্কের বিস্তর টাকা ভাঙ্গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।" এই সংবাদটি দরিদ্র পাঞ্জাবীদের হৃদয়ে দারুণ শেলাঘাত করিল। তাহারা দলে দলে অশ্রুসিক্ত নয়নে ব্যাঙ্কের সম্মুখে গিয়া হাজির হইল। এদিকে রমার নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছিল, তখন তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে নানাপ্রকার চিন্তা যুগপৎ উদিত হইয়া তাঁহার ধারণাশক্তিকে একরূপ উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। রমার যেন জগতের দিকে নয়ন মেলিতে লজ্জা হইতেছিল। তাঁহার দরিদ্র দেশবাসীরা যে নিরাপদ জানিয়া, তাহাদের সর্ব্বস্ব চোর ডাকাতের ভয়ে ঐ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছে।

সেদিনকার সন্ধ্যার কথা সহসা রমার মনে পড়িল, তবে কি সত্যই কোচম্যানেরা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া হাসিয়াছিল, জনসঙ্ঘ তাঁহার দিকে উৎসুক-দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল। আবার তখনই মনে মনে বলিলেন, যাহার নিকট সামান্য টাকা জমা রাখিয়া বিশ্বাস হয় না, তাঁহার নিকট কি না, একটী অবলম্বনবিহীন অসহায় হৃদয় চিরজীবনের জন্য অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তারপর তিনি আপনার ভিতর যেন আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। হৃদয়ের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল—তিনি কক্ষের মধ্যে অনেকক্ষণ পায়চারি করিলেন। যাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে রমা মনে মনে একরূপ স্থির করিয়াছিলেন, যাঁহার বিকট মুখশ্রী, বিপুল দেহ তাঁহার এ সংকল্পে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই, আজিকার এই ব্যাপার চিরদিনের জন্য তাঁহার উপর ঘৃণা আনিয়া দিল।

(৩)

মেদিনীপুরের নিকটেই একটী ঘন নিবিড় জঙ্গল। এই জঙ্গলের গভীরতম প্রদেশে একটী অতি প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা। ভগ্ন-গৃহভিত্তির চতুর্দ্দিক নানাজাতীয় বন্যবৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন। গৃহের অস্তিত্ব বাহির হইতে পরিদৃষ্ট হয় না।

ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙ্গিয়া, রমেশবাবু যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি মনের শান্তি চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যে দিন তিনি টাকা ভাঙ্গেন, সে দিন যেন অন্য কোন এক শক্তির প্রভাবে অভিভূত হইয়া তিনি যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। যে রাত্রিতে তিনি পাঞ্জাব হইতে পলায়ন করেন, তাহার পরদিন প্রভাত হইতেই বিশ্বসংসার তাঁহার দৃষ্টিতে

সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইল। সংসাররঙ্গমঞ্চে যেন আর একখানি নূতন নাটকের যবনিকা উত্তোলিত হইল। সকলের দৃষ্টিই তাঁহার নিকট কুটিল বলিয়া বোধ হইল। সকলেই যেন বিশ্বসংসারের সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার নিমিত্ত নীরবে ষড়যন্ত্র করিতেছে। এ সংসারে তিনি এমন একজনকে খুঁজিয়া পাইলেন না, যাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাস করিয়া শান্ত হইতে পারেন।

সেই সময় স্বদেশী-আন্দোলন উপলক্ষে পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সাধু-সন্ন্যাসী ও ছদ্মবেশীদিগের উপর খুব প্রবল। রমেশবাবু ভাবিলেন, কোন প্রকারে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইলেই তিনি ধরা পড়িবেন। অপমান, নির্য্যাতন, শেষে কারাগারে গমন পর্য্যন্ত! অমনই ঘৃণায়, লজ্জায়, তিনি এতটুকু হইয়া যাইতেন,—বুকের ভিতর বিপুল বেদনা অনুভব করিতেন। সমস্ত সংসারটা যেন শূন্য—কোনও খানে যে একটু মমতা আছে, একটু আকর্ষণ আছে, এরূপ বলিয়া বোধ হইত না। নির্ব্বাক টাকাগুলির মধ্যে এত যন্ত্রণা, এত অশান্তি, তিনি একবারও এরূপ কল্পনা করিতে পারেন নাই। একবার মনে করিলেন, সকল অশান্তির মূল টাকাগুলি ফিরাইয়া দিয়া আসিবেন; কিন্তু এখন কি আর ফিরাইয়া দিবার সময় আছে! যদি ফিরাইতে গিয়া ধরা পড়েন, তবে ত—আর ভাবিতে পারিলেন না, তিনি দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পর টাকাগুলির উপর তাঁহার বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই মঙ্গল স্থির করিলেন।

তিনি বরাবর মেদিনীপুরে আসিয়া নামিলেন। বাল্যকালে মেদিনীপুরে তিনি লেখাপড়া করিয়াছিলেন, সুতরাং এখানকার অনেক স্থানই

তাঁহার পরিচিত। একটী চটিতে একদিন অবস্থান করিলেন। পর-দিন খুব গোপনে উল্লিখিত জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই ভগ্ন-অট্টালিকার একটী গৃহে তিনি থাকেন। সেখানে তিনি কোন মতে জীবন অতিবাহিত করেন। রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় না, মনে হয়, বুঝি কে তাঁহার টাকার সন্ধান পাইয়াছে—টাকা খুঁজিতে আসিতেছে, হয় ত তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। অমনই তিনি উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিয়া বসেন, উদ্‌গ্রীব হইয়া চারিদিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিতে থাকেন। পাপিয়া যখন মধুরকণ্ঠে বনানী ঝঙ্কৃত করিতে থাকে—শুষ্কপত্রের উপর বন্যজন্তুর পদশব্দ হয়, তখন তিনি আতঙ্কে নিশ্চল হইয়া যান। একদিন আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া টাকাগুলি দূরে একটী বৃক্ষমূলে পুঁতিয়া রাখিয়া মনে করিলেন, তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু সেইদিন হইতে যেন তাঁহার দুর্ভাবনা আরও অধিক হইয়া উঠিল। গভীর নিশিতে যখন শশাঙ্কের বিমল রশ্মি, ঘনতরুরাজির নিবিড়তা বিচ্ছিন্ন করিয়া, খণ্ড খণ্ড আকারে সেই তরুমূলে সঞ্চারিত হইত, তখন রমেশের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া যাইত। আশঙ্কায় তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া মনে করিতেন, এত-দিনে পুলিশ নিশ্চয় সন্ধান করিয়া আসিয়াছে।

একদিন তিনি মনে করিলেন, নিষ্কর্ম্মা থাকিলে ভাবনা বৃদ্ধি পায়, কল্য হইতে একটা কাজের সন্ধান করা যাক্। কি করা যাইবে? শেষে স্থির হইল, এই বাড়ীটি ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করা যাক্। পরদিন তাঁহার সমস্ত শক্তি গৃহপরিষ্কার-কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। পরি-শ্রমের ফল হতভাগ্যের হাতে হাতে লাভ হইল। গৃহের ভিতর সহসা এক কলসী মোহর মৃত্তিকার গুপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার

ক্লান্ত পরিশ্রমকে জয়মাল্য-বিভূষিত করিল। দেবী-চৌধুরাণীর গল্প রমেশের মনে পড়িল। ইহাকেই অদৃষ্টের বিদ্রূপ বুঝিয়া তিনি নীরব হইলেন। তিনি যে এখন অর্থের বিরোধী, তবু অর্থ তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে কৈ? রমেশ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। আবার এগুলিকে লইয়া তিনি কি করিবেন? তাঁহার অদৃষ্টে নিশ্চয় কারাবাস!

তারপর তিনি ভাবিলেন "এত টাকা লইয়া কেন কষ্ট পাই? কালই এ জঙ্গল ত্যাগ করিব। ভারতবর্ষে যখন আমার স্থান সঙ্কুলান হইল না, তখন বিলাতে গিয়া যদি বাস করি, কে আমায় চিনিতে পারিবে?" তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল। পরদিন মেদিনীপুর সহরে গিয়া তুইটী সাহেবী পোষাক ক্রয় করিলেন। আসবাবপত্র সংগ্রহ করিয়া একদিন রাত্রের গাড়ীতে তিনি মেদিনীপুর ত্যাগ করিলেন সত্য; কিন্তু আশঙ্কা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তবে যখন দীর্ঘ নির্ব্বাসনের পর গাড়ীর আরসিতে নিজের আকৃতি অবলোকন করিলেন, তখন নিমিষের মধ্যে তাঁহার সকল সন্দেহ ও আশঙ্কা দূর হইল, এমন কি, নিজেকে দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না।

অমন যে ভীমসদৃশ দেহ, তাহা কি না এই কয়মাস অজ্ঞাতবাসে পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে হইয়া গিয়াছে। ভগবান যেন তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। ভাবিলেন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। খুব সাহস করিয়া তিনি তখন কেশবিন্যাসে মনোনিবেশ করিলেন।

(৪)

সেবার কলিকাতা মহানগরীতে কনগ্রেসের অধিবেশন। খুব হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। উদ্যম, উৎসাহ, কর্ম্মতৎপরতা, প্রত্যেক স্বদেশবৎসল বঙ্গীয়যুবকের মুখে, কথায়, হাসিতে, চলাফেরার মধ্যে পরি-

লক্ষিত হইতেছে। ঐই উপলক্ষে সেবার একটী বৃহৎ প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রদর্শনী দেখিতেও নানাস্থান হইতে লোকজন আগমন করিতেছে।

বিদুষী রমাবাই ব্যাঙ্কের দরুণ অনেক টাকা লোকসান দিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বৎসর তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হওয়ায়, রমা পুনরায় বিপুল ধনরত্নের অধিকারিণী হন। তিনি কাশীপরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় কন্‌গ্রেস ও প্রদর্শনী দেখিতে আসিবেন, স্থির করিয়াছেন। কাশীর যে বাটীতে রমা বাসা লইয়াছেন, ঠিক তার সম্মুখের গৃহে একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকও বাসা লইয়াছেন। এই লোকটীর সহিত রমার খুব শীঘ্রই পরিচয় হইয়া গেল। লোকটী রমাকে দেখিয়া প্রথমে একটু চমকাইয়াছিলেন। একটা আশঙ্কায় তিনি যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কথায় কথায় রমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কয়দিন কাশীতে থাকিবেন?"

প্রথমটা রমেশের যেন কথা কহিতে মোটেই ভাল লাগিল না, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া বলিলেন—"কোন ঠিক নেই, দেশ দেখা উদ্দেশ্য, যতদিন ভাল লাগে থাকিব।"

"আপনি কি বরাবর কল্‌কাতায় যাবেন?"

তিনি মাথা নীচু করিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ।"

"আপনি কন্‌গ্রেসে যাবেন না? এবার ত আপনাদের দেশেই কন্‌গ্রেস, প্রদর্শনী!"

"এবার আমাদের ভাগ্যে পড়েছে, কিন্তু—" বলিয়া তিনি চক্ষু তুলিয়া রমার দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন।

"চলুন না কন্‌গ্রেস দেখে, তখন দেশভ্রমণে বেরুবেন? আপনি

কখন কি পাঞ্জাবে গিয়েছেন? পাঞ্জাবে অনেক দেখবার জিনিষ আছে, তাহা সকলেরই দেখা উচিত।”

ভদ্রলোক পুনরায় একটু চম্‌কাইয়া উঠিলেন। বলিলেন “হাঁ, একবার যাবার ইচ্ছা আছে বটে।”

“চলুন কন্‌গ্রেস ও প্রদর্শনী দেখে, আমাদের দেশ হ’য়ে অন্যত্র যাবেন।”

রমেশবাবুর এ কথাটা বড় ভাল লাগিল না। মনে মনে বলিলেন, “আপদ ত্যাগ করিলে বাঁচি,” কিন্তু কি ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—“তবে না হয় চলুন, কিন্তু বেশীদিন সেখানে বিলম্ব করতে পারব না। আপনার ত খুব ঝোঁক দেখ্‌ছি।”

মহিলা মৃদুমধুর হাসিলেন। প্রশংসার মৃদু আঘাত তাঁহার সুকোমল অন্তরে বেশ একটী সুস্পর্শ আনিয়া দিল। দুই তিন দিন তাঁহারা কাশীতে অবস্থান করিলেন। পরস্পরের ভিতর খুব আলাপ ও পরিচয় হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে রমেশবাবুর চমকানিও অনেকটা কমিয়া আসিল।

একদিন সন্ধ্যার পর দুইজনে বসিয়া নানারূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী বলিলেন, “আপনার খুব উৎসাহ, খুব বড় উদ্দেশ্য দেখ্‌চি।”

রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। আত্মপ্রশংসা শ্রবণে লজ্জায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

“আচ্ছা, আপনি বল্‌লেন,—রমেশবাবু টাকা ভেঙ্গে পলায়ন করলে, পুলিশ তাঁহার কোন সন্ধান করতে পা’রল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ’য়েছিল?”

"হ'য়েছিল বৈ কি !"

"আমার বোধ হয় কেহ তেমন চেষ্টা করে নাই। পরের টাকায় সাধারণের বড় একটা সহানুভূতি দেখা যায় না। নইলে লোকটা কি উড়ে গেল, কি বলুন ?" বলিয়া ভদ্রলোকটী আগ্রহভরে রমার মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

রমা বলিলেন, "তাত বটেই, তেমন চেষ্টা অবশ্য হয় নাই। তবে একেবারে যে কোন চেষ্টা হয় নাই, সে কথাও বলা যায় না।"

"তাঁহার দেশে বোধ হয় অনুসন্ধান করা হয় নাই।"

"লোকটা দেশেও ফিরে যায় নাই। কারণ সেখানে পুলিস গিয়েছিল। ও কি ? আপনি চম্‌কে উঠলেন যে ?"

"ছি ! ছি ! লজ্জায় আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

"আপনি এতটা মনে কর্‌বেন জান্‌লে ও কথা তুল্‌তাম না।"

"ভাব্‌চি, লোকটা বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক !"

"না, না, একজনের অপরাধের জন্য সমস্ত জাতির উপর দোষারোপ কর্‌বেন না।"

"তা হ'লে এখন একরকম সব চুকে গিয়েছে, তাকে ধরবার কোন চেষ্টাই নাই, কেমন ?"

"হাঁ, আর কোন গোল নাই ব'লে বোধ হয়।"

ভদ্রলোকটী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যেন গুরুতর চিন্তাভারে তাঁহার মুখ বিষণ্ণ। রমা তাঁহাকে সহসা নিরুত্তর অবলোকন করিয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, ভদ্রলোকটী খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আহা, কত দরিদ্রের যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তার আর

ইয়ত্তা নাই। শিক্ষিত লোক এমন হয়? বড় লজ্জার কথা! ও রকম অধম লোককে ধরিয়ে দিলে পুণ্য আছে, কি বলুন?"

"আপনার দেখ্‌চি খুব মহৎ অন্তঃকরণ। আপনি পরের জন্য এতটা ভাবেন! এ ঘটনা শুনে দেখ্‌ছি খুব কষ্ট অনুভব করেছেন।"

"দেখুন দেখি লোকটা কত বড় পাজি, দেশের শত্রুতা করেছে, কাঙ্গাল-গরীবের সর্ব্বনাশ কর্‌তে প্রাণে একটু ভয় হোল না?"

"হয় ত ভদ্রলোক প্রলোভন সামলাইতে পারেন নাই। অনেক সময় গ্রহের ফেরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে অনেক কাজ করিয়া ভবিষ্যতে অনুতপ্ত হয়।"

এই সময় একজন ভিক্ষুক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কান্নার সুরে জানাইল—"মশায়, আমার যথাসর্ব্বস্ব চোরে নিয়ে গিয়েছে। এই দারুণ শীতে মারা গেনু। আপনারা মা বাপ—একটা গায়ের কাপড়, 'ছেঁড়া টেড়া' দিন। জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করবেন।"

রমেশবাবু তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের কাপড়খানি খুলিয়া দুইটী টাকা সমেত ভিক্ষুককে প্রদান করিলেন।

ভিক্ষুক অপ্রত্যাশিত দানে প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া উভয়ের মুখের দিকে সভয়ে তাকাইল।

"নাও নাও, কোন ভয় নাই। তোমাকে দিলাম।"

সে উর্দ্ধে দুই হস্ত তুলিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত আশীর্ব্বাদ-বাণী বর্ষণ করিতে করিতে, প্রথমটা পা পা করিয়া, পরে সিঁড়িতে নামিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল।

রমা নির্ব্বাক্ হইয়া ভদ্রলোকটীর মুখের দিকে অনিমেষনয়নে এতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন। রমা মনে মনে ভদ্রলোকটীর দান ও করুণার

অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। লোকটী যে সজ্জন, সে সংস্কার রমার কোমল হৃদয়ে অনেক পূর্ব্বেই রেখাপাত করিয়াছিল। উপস্থিত এই দানব্যাপারে রমার চিত্ত আপনা হইতেই ভদ্রলোকটীকে হৃদয়মন্দিরে অভিনন্দন করিয়া লইল। কোনও এক শুভ-মুহূর্ত্ত আসে, যখন একটা সামান্য কথায় অসাধ্য-সাধন হইতে দেখা যায়। চিত্রকরের কুসুম-কোমল তুলিকার অতি সূক্ষ্ম রেখা-পাতে যেমন চিত্রের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণতায় উপনীত হয়; আজও এই দানের মধ্য দিয়া এমন একটী মধুর বন্ধনাকর্ষণ রমার সহৃদয় চিত্তকে সর্ব্বদিক হইতে বেষ্টন করিল যে, রমা অকুণ্ঠিত অন্তরে বলিলেন, "আপনি ইচ্ছা করলে সংসারে অনেক ভাল কাজ ক'রতে পারেন, আপনি বিবাহ ক'রে সংসারী হ'ন না কেন?" বলা শেষ হইলে রমার কণ্ঠস্বর কেমন লজ্জায় নীচু হইয়া গেল, যেন কেমন একটু জড়াইয়া গেল।

কাশীতে তিন দিন অতিবাহিত করিয়া উভয়ে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

(৫)

কলিকাতায় তাঁহারা কন্‌গ্রেস ও প্রদর্শনী প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে বেশ মনের মিল হইয়াছিল। এই মিলনটীকে "মজবুত" করিতে প্রজাপতি তাঁর রঙ্গিন ডানা বিস্তার করিয়া রমা ও ভদ্রলোকটীর কথোপকথনের মাঝখানে, সময়-অসময়ে দেখা দিতে লাগিলেন।

রমা এই আগন্তুক অতিথির অভ্যর্থনা না করিলেও, ভদ্রলোকটী বিস্ময়দৃষ্টিতে তাঁহার যাতায়াত লক্ষ্য করিতেন; কারণ প্রজাপতির আগমনের ধার রমা ততটা ধারিতেন না, যতটা বাঙ্গালী ভদ্রলোক

ধারিতেন। বাক্য-বিনিময় হইতে হইতে একদিন প্রজাপতির অনুগ্রহে হৃদয়-বিনিময়ের দিন স্থির হইয়া গেল।

সে দিন মধ্যাহ্নে রমেশবাবু বলিলেন—"দেখ রমা, এই মুক্তার মালাছড়া তোমার গলায় কেমন মানায়—" বলিয়া রমেশবাবু রমার কণ্ঠে মুক্তার মালা সাদরে পরাইয়া দিলেন। রমার মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া গেল। রমা নিজের অঙ্গুলি হইতে একটী আংটী উন্মোচন করিয়া কিছু না বলিয়া রমেশবাবুর অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে পরাইয়া দিলেন। তখন হঠাৎ রমার মনটা কেমন এক অজ্ঞাত কারণে চঞ্চল হইয়া উঠিল। আগামী কল্য তাঁহাদের শুভ-মিলন হইবে এই কথা স্মরণ করিতেই যেন সুদূর অতীতের এমনই একটি স্মৃতি আজ তাঁহার চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিল। সে দিন, রমা কত কথা ভাবিয়াছিল, মনের সহিত কত তর্ক করিয়াছিল—আজ কিন্তু কিছু ভাবিল না। তথাপি তাঁহার বক্ষ কি জানি কেন কাঁপিল। এই শুভ-মিলনের পূর্ব্বে যেন কোথা হইতে একখানি কাল মেঘ তাঁহার শুভ্র জ্যোৎস্নার মত আনন্দকে চতুর্দ্দিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চকিতের মত তাঁহার মনে হইল, ইনি যদি আবার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের মত হ'ন, তারপর জিভ্ কাটিয়া নিজের নিকট নিজেই লজ্জিত হইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইজনে প্রদর্শনী দেখিতে যাত্রা করিলেন। আগামী কল্য তাঁহাদের শুভ-পরিণয়।

প্রদর্শনীর মধ্যে আসিয়া রমা বলিলেন, "দেখুন, আমাদের ত প্রায় সব দেখা হইয়াছে, কেবল এই লাফিং-গ্যালারি বা হাসির হাট দেখিতে বাকি আছে, চলুন আজ ঐটে দেখে যাওয়া যাক্।" রমেশবাবু বলিলেন, "তাই চল।"

উভয়ে হাসিতে হাসিতে 'হাসির হাটে' গিয়া উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোকমালা; হাসির হাটে যেন সহস্র তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফুলের সৌগন্ধে ও দর্শকের হাসির কলরবে কক্ষ ভরপুর। অগ্রে রমা, পশ্চাতে রমেশবাবু। সকলের আকৃতিই কক্ষের দর্পণে অস্বাভাবিক দেখাইতেছে। দর্শকগণ নিজ নিজ আকৃতির অসম্ভব পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে অধীর হইয়া পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। রমা প্রথমে নিজেকে ভয়ঙ্কর বেঁটে ও স্থূলকায় দেখিলেন এবং হাসিতে হাসিতে রমেশবাবুকে কেমন দেখাইতেছে মনে করিয়া যেমন নয়ন ফিরাইবেন, অমনই হাসির হাটের অসংখ্য আরশিতে রমেশবাবুর স্থূল আকৃতি দেখিয়া তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। বিকট চীৎকার করিয়া জড়িতকণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"অঁ্যা! অঁ্যা! তুমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার—তুমি!"

পুনর্ম্মিলন

কমলপুরের বদনগোয়ালা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। সে ভ্রাতা ও স্ত্রীর অজস্র নয়ন-জল উপেক্ষা করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মহামূল্য রত্নলাভের মত গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকগুলি এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটীকে তাহাদের অবলম্বনহীন জীবনে বরণ করিয়া লইল ও হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পাঠশালার গুরুমহাশয দারুণ দুর্ভাবনায় ছেলেদের ছুটি দিয়া সঞ্চিত তামাক নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বৈঠকখানায়, অন্দরমহলে ও রন্ধনশালায় সর্ব্বত্রই এই আন্দোলন অবাধগতিতে চলিল। কেহ মুখ বিকৃত করিল—কেহ বা গালে হাত দিয়া নির্ব্বাক হইল, কেহ উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কলির শেষ হইতে যে আর বেশী বিলম্ব নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, বন্যার প্লাবনের মত এ সংবাদ ছুটিয়া চলিল। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিদিনের পরিচিত বদনগোয়ালাকে দেখিতে ছুটিল। কেহ বলিল, "গুম্ফ-বিহীন বদনে কল্‌মা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আবক্ষ-বিস্তৃত দাড়ি গজাইয়াছে"; আবার কেহ বলিল, "সে পার্সীভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতেছে।" একটী স্ত্রীলোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল; সে বলিল, সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, বদন তার নিজের একটী গরু কাটিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কাঁচা মাংস খাইতেছে।

আসল কথা হইতেছে যে, বদন একজন মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়াছে৷ আত্মীয়স্বজন মুসলমান-রমণীকে পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করায়

সে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। গরুও কাটে নাই—বা তাহার অকস্মাৎ দাড়িও গজায় নাই।

(২)

কমলপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে রহিমপুর গণ্ডগ্রাম। এখানে অনেকগুলি মুসলমান ও কৈবর্ত্তের বসবাস। কমলপুর ত্যাগ করিয়া বদন এখানে আসিয়া একখানি চালা বাঁধিয়াছে। তাহার মধ্যে সে তাহার যবনী স্ত্রীর সহিত নিতান্ত অপরাধীর মত অবস্থান করে। বদন যদি একটু আধটু লেখাপড়া জানিত, তাহা হইলে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য রাজপুত ও মুসলমানদিগের ইতিহাস হইতে আদর্শ-প্রেমের উদাহরণ স্বরূপ সে অজস্র ঘটনার উল্লেখ করিতে পারিত।

মুসলমানীর প্রেমে যখন বদন গোয়ালা আত্মহারা, তখন কমলপুরের একখানি কুটীরপ্রাঙ্গণে অতি প্রত্যূষে একটী যুবতী গোময় লেপন করিতেছে, আর অবিরত অঞ্চলে নয়ন-জল মুছিতেছে। বাড়ীর মধ্যে দুইখানি শয়ন-গৃহ, একখানি রান্নাঘর ও উঠানের দক্ষিণে একটী বড় গোয়াল। সেখানে চার পাঁচটী গরু ডাবায় জাব খাইতেছে। দুইটী কুকুর গোয়ালের দাওয়ায় পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। চারিদিক হইতে পাখীদের সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। বাড়ীর মধ্যে একটী সেফালিফুলের গাছ—গাছের তলায় রাশি রাশি পুষ্প নক্ষত্রের মত ছড়াইয়া রহিয়াছে। যুবতী গোবর দিতে দিতে একবার সহসা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। তারপর অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিল ও তাড়াতাড়ি একাগ্রচিত্তে ন্যাতা বুলাইতে লাগিল।

এই সময় "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া সম্মুখের ঘর হইতে বদনের ছোট ভাই

রমণ খিল খুলিয়া বাহিরে আসিল। তখনও একটু ঘোর আছে, ভোরের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই।

"হাঁ বৌ ঠাকুরুণ, তুমি কখন উঠেছ? এর মধ্যেই যে গরুর পাট সারা হয়ে গিয়েছে দেখ্‌চি।"

"হাঁ ঠাকুরপো, একটু সকাল সকাল উঠেচি, আজ আবার লক্ষ্মীপূজা আছে কি না।"

রমণের মনে হইল, দাদা এমন লক্ষ্মী-বৌ পায়ে ঠেলিল, পাছে বৌকে নিতে হয় ব'লে কি না জাত খোয়াল, তারপর দাওয়ায় বসিয়া চকমকি ঠুকিয়া একছিলুম তামাক সাজিল, উবু হইয়া বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তামাক টানিতে লাগিল, আর অনন্ত চিন্তার স্রোতে তাহার হৃদয়তরীখানি ভাসিয়া চলিল।

এই সময় কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া কাঁধে গামছা ফেলিয়া কানে দুইটা কল্‌কেফুল গুঁজিয়া হরিঠাকুর আধ বাঙ্গালা, আধ সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ডাকিলেন "কোথা হে রমণ? বাড়ীতে ব'লে দাও, আজ অনেক বাড়ীই পূজা আছে, এসে ব'সে থাক্‌তে পার্‌ব না। সব যেন গোছগাছ থাকে। আমি এসেই নিবেদন ক'রে দেব, বুঝ্‌লে?"

হুঁকা রাখিয়া রমণ শশব্যস্তে উঠিয়া বলিল, "প্রাতঃপ্রণাম হই দেবতা! কোন চিন্তে নেই। সব ঠিক্ করে রাখ্‌চি।"

"কলকেটার ধূঁয়া উড়চে না, আছে নাকি?"

রমণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া কলাপাতা ছিঁড়িয়া আনিল। বড়ন্তে তামাক সাজিয়া দিল। দেবতা তামাক খাইতে খাইতে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "বদন এদিকে আসে টাসে না ত? কোনো খবর টবর পাস্?"

রমণ যেন ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল। সে বৌ-ঠাকুরুণের মুখের দিকে একবার তাকাইল, পরে ধীরে ধীরে ভয়-বিজড়িতকণ্ঠে কহিল, "কেন দেবতা, আজ একথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন? দাদা ত সেই অবধি এ মুখো হয় না, আর আমরাও তা'র কোন খবর রাখি না। রেখেই বা কি করব বলুন?"

"কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! তার খবর আবার মানুষে রাখে! মতিচ্ছন্ন ধরেছে। এবার টের পাবে—কত ধানে কত চা'ল। হাঁ, হাঁ, সেই কথাটা বল্‌ছিনু যে, বৌকে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দেবার কি করলে?"

বৌ চোখ মুছিয়া কলসীকক্ষে পুষ্করিণীতে চলিয়া গেল। রমণ বলিল, "বড় দেনা হয়ে গিয়েছে, একটু সেরে উঠ্‌তে দিন।"

"তা বেশ, তা বেশ, আমার কি—পাছে কেউ একটা আবার গোল পাকায়—এই যা ভয়। আচ্ছা তাই হবে—তুমি আগে একটু সাম্‌লে নাও।"

(৩)

বদন বলিল—"না বিবিসাহেব, আমি ত রাগ করিনি, শরীরটা ভাল নয়, তাই খাব না।" বদন কাহার নিকট শুনিয়াছিল, মুসলমান রমণীদের আদর করিয়া "বিবি সাহেব" সম্বোধন করিতে হয়। বদনের যবনী স্ত্রীর নাম সাকিনা বিবি। সে তেমন ভাল রাঁধিতে পারে না, বদন তাহাকে যথেষ্ট ভাল বাসিলেও তাহার রান্না মোটেই ভাল বাসিত না। আহার করিতে উপবেশন করিলেই অন্নপ্রাশনের অন্ন নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম হইত। প্রথম প্রথম সে শরীর অসুস্থ, আজ নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি প্রভৃতি অছিলায় নিষ্কৃতিলাভ করিতে প্রয়াস পাইত; কিন্তু চতুরা

সাকিনার নিকট সকল মিথ্যা অচিরে ধরা পড়িয়া গেল। তখন বদন এদিকে ক্রমে ক্রমে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িল।

ছাঁচা জলে চাষ হয় না, ধার করা টাকায় কেহ বড়মানুষ হয় না, দুইটী মিষ্টি কথায় প্রেম হয় না। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বদনের প্রেমে কেমন সন্দেহ জন্মাইল। এই সময় একদিন বদন রুটী বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল; তখন সন্ধ্যার অন্ধকার তরু-শিরে ছাইয়া পড়িয়াছে, দূর হইতে এক একবার শৃগালের চীৎকার শ্রুত হইতেছে। সে দিন বদন বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—বিক্রয়ও তেমন সুবিধা মত হয় নাই। তাহার উপর হাটে তাহাদের গাঁয়ের ডাক্তার রসিক খুড়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়। রসিক খুড়া তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিলে, বদনের প্রাণ ব্যাকুল হয় এবং সহজ ও সাধারণ ভাবেই সে জিজ্ঞাসা করে "রমণ, কেমন আছে?" রসিক ডাক্তার বলেন, "সে ভাল আছে। তবে তোমার স্ত্রীর বড় অসুখ ক'রেছিল, আজ দেখ্‌তে গিয়েছিনু —আহা বেচারী বিধবার মত অশ্রুজলে দিন কাটাইতেছে। তাহাকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। না বুঝে এমন কাজ কর্‌লি যে, নিজেও গেলি আর সে ছুঁড়ীটাকেও মার্‌লি।" সেই পর্য্যন্ত বদনের মাথার মধ্যে যেন কোন চিন্তাই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছিল না। সকল জিনিষ সকল দৃশ্যের মধ্যেই সে কেমন একটা বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করিতে লাগিল—কোনখানেই সে নিজেকে যেন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইল না। খণ্ড খণ্ড কালোমেঘের মত যেন সে অকারণ ভাসিয়া চলিয়াছে। সে দিন সে অনেক চেষ্টা করিয়াও সাকিনার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

তারপর সাকিনার সহিত একদিন তুচ্ছ কথা লইয়া বদনের

ঘোরতর কলহ হইল। তাহার পরদিন হইতে অতীতের বদন গোয়ালা, বর্ত্তমানের রুটিওয়ালা বুদরউদ্দিন মিঞা, নিরুদ্দেশ হইল।

(৪)

বদনের হিন্দু-স্ত্রী রাধারাণীর নয়নজলেই দিনাতিপাত হইতে লাগিল। স্বামী তাহার পক্ষে চিরদিনের জন্য মৃত। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় তাহাদের বাড়ীর নিকট বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে বদন আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর যখন অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল, তখন ধীরে ধীরে বাল্যের ক্রীড়াক্ষেত্র ও যৌবনের আনন্দ-গৃহের দ্বারে শঙ্কিতহৃদয়ে কম্পিতচরণে গিয়া সে উপস্থিত হইল। বদন দেখিল, সেই ভগ্ন কুটীরখানি বেড়িয়া যেন নিখিলের সকল শোভা, সকল সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। গোয়াল-ঘর হইতে প্রদীপ-হস্তে কে একজন অবগুণ্ঠন দিয়া রন্ধনগৃহের অভিমুখে গমন করিল। বদনের বুকের ভিতর সঞ্চিত বেদনা নিমিষে জাগিয়া উঠিল। সে মনে করিল, এই বাড়ীর উঠানে আজ যদি শয়ন করিবার অধিকার পায়, তবে ইন্দ্রের অমরত্বও সে অবহেলা করে। এই সময় একটী গরু তাহার সম্মুখ দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, বদন তাহার গাত্রে আগ্রহে হস্ত বুলাইয়া দিল। গরুর অঙ্গ-স্পর্শে যেন অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল! পরক্ষণেই তাহার মনে হইল কি করিলাম, কেন ইহাদের গরু স্পর্শ করিলাম—আমার যে জাত নেই, আমি যে হিন্দুর অস্পৃশ্য হইয়া গিয়াছি। আমি যে বদন সেই আছি, কিন্তু, কেন আমার মনে এমন হয় যে, আমি হিন্দুর নিকট সর্ব্বদিক্ হইতে নাই। সাধারণ মুসলমানকে হিন্দু কেমন ভাইয়ের মত বাড়ীতে বসিতে দেয়, একসঙ্গে গল্প করে, হাস্যপরিহাস করে; তাহার মধ্যে কোনও বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই, ঘৃণা নাই;

আর আমি—তাহার নয়ন দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বদন ডাকিল—"রমণ!" কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ, অস্পষ্ট,—সে কথা বোধ হয় বদন ভিন্ন অপর কেহ শুনিতে পাইল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বদন অন্ধকারে নির্ব্বাক্ হইয়া কত কি ভাবিল, তারপর আর ডাকিতে সাহস হইল না, বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

(৫)

রমণ খুব ভোরে সে দিন উঠিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল কে একজন দাওয়ার উপর শুইয়া রহিয়াছে। রমণের মনে ভয় হইল। ভোরের সময় উপদেবতারা যাতায়াত করিয়া থাকেন, সময় সময় কাহারও বাড়ীতে গিয়া তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন; হয় ত তাহার বাড়ীতে প্রভুর ভর হইয়াছে। প্রভাতস্নিগ্ধ বাতাসে চাঁপার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কারে প্রাণ আমোদিত হইতে-ছিল। অন্ধকারের নিবিড় বন্ধন শিথিল করিয়া উষার আলোক সঙ্কোচে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল—আলো ও অন্ধকারের ক্ষণস্থায়ী মিলনের মধ্যে রমণের সহিত বদনের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। অনেক কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল, বাঁশঝাড়ের নিকট বদন একখানি চালা তুলিবে এবং শেষ জীবনটা আত্মীয়দিগকে সুধু চোখে দেখিয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। রমণ কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও ভাইকে মুসলমান ভাবিতে পারিল না। সে মনে মনে বদনকে সেই বড়ভাইই দেখিল। সে বলিল, "দাদা, কেন এমন কাজ করলে? তোমার নিজের ঘরে তুমি আজ পর হ'লে?"

বদন কোনও উত্তর দিল না, কেবল একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

রমণ চোখের জল মুছিল। তখন অন্যান্য বাড়ীতে দুই একজন করিয়া লোক উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। বদন বলিল, "রমণ, তুই ভিতরে যা, কেউ দেখ্‌তে পেলে সর্ব্বনাশ হবে। সকলের সাম্‌নে তোর সঙ্গে আজ আবার দেখা কর্‌ব।" বদন বাগানের ভিতর গিয়া বোধ হয় লুকাইয়া রহিল। বদন মনে করিল, তাহাকে কেউ দেখিতে পায় নাই; কিন্তু তাহার অজ্ঞাতে একজন যে তাহাকে দেখিয়াছিল এবং ছুটিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া অঞ্চলে শতবার চোখের জল মুছিয়াছিল, তাহা সে জানিতে পারিল না।

(৬)

বদন বাঁশঝাড়ের নিকট চালা ঘরে অতি কষ্টে থাকে। ভদ্রলোকের জনমজুর খাটে। নিজে জল তোলে, কাঠ কাটে ও রান্না করে, আর ছেঁড়ামাদুরে পড়িয়া পড়িয়া কত কি ভাবে—সে ভাবনার কূল কিনারা নাই। সে যেন বিশ্বের মধ্যে বিনাকারণে বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাহার এরূপ করিয়া বাঁচার যেন কোন সার্থকতা নাই। মনে কত রকম চিন্তা আসিয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে—সে তখন নিজেকে মুসলমান বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারে না। সে দিন পথ দিয়া একজন বৈষ্ণব গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—কি ভাবিয়া বদন তাহাকে ডাকিল; জিজ্ঞাসা করিল "কৃষ্ণের কত নাম?" বৈরাগী মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "একশত আট নাম" বলিয়া খত্তালে ঘা দিল ও গাহিল "নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দের নন্দন।" বদন তাড়াতাড়ি তাহাকে একটী পয়সা দিয়া বলিল "তুমি যাও, আর গাহিতে হবে না।" বৈষ্ণব অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল।

বদনের স্ত্রী রাধারাণী সেই পথ দিয়াই পুষ্করিণীতে স্নান

করিতে ও জল আনিতে যায়। রাধারাণীর দেবর তাহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছে, "দেখো বৌ ঠাকুরুণ, খবরদার যেন দাদার সঙ্গে দেখা ক'রো না। দাদা ডাক্‌লেও তার কথা শুনো না। তা হ'লে এই ছেলেপুলে নিয়ে মারা পড়ব।" রমণ খুব গম্ভীর হইয়া কথাগুলি বলিত, কিন্তু তখনই পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিত। রাধারাণী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিত সত্য, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর এই সায় দেওয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি নারীহৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিত।

আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া রমণ তাড়াতাড়ি গরুগুলি গোয়ালে বাঁধিল। এখনই ঝড় উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। দলে দলে পক্ষিকুল কুলায় ফিরিতেছে। বাদ্‌লাপোকা বিপুল বিক্রমে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া উল্লাসে হাততালি দিয়া গায়িতেছে "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেবো মেপে।" তখন রাধারাণী একটী কলসীকক্ষে জল আনিতে বাড়ী হইতে দ্রুতপদবিক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইল। বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করিয়া জল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পথে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি আসিল। বড় বড় গাছের শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া অতি সন্তর্পণে বদনের দাওয়ার একটী কোণে রাধারাণী আশ্রয় লইল। তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, আশঙ্কা পাছে কেহ দেখিতে পায়।

তখন বদন মাতুরে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতেছিল; যেন সে আবার কোনও ইন্দ্রজালে হিন্দু হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে; যেন রাধারাণী তাহার নিকট আসিয়াছে,

তাহার কুঁড়ে ঘরে গৃহিণী হইয়া ঘর আলো করিয়াছে, যেন ভাত বাড়িয়া তাহাকে আহ্বান করিতেছে। ঠিক সেই সময় পদশব্দ শুনিয়া বদন নয়ন উন্মীলিত করিল। বহুদিন পরে চারি চক্ষের মিলন হইল। সে দেখিল, রাধারাণী কলসীকক্ষে তাহার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। রাধারাণী আতঙ্কে কাঁপিতেছিল। বদন মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি এসেছ, আজ দু'দিন জ্বর হ'য়েছে—উঠতে পারি নি,—একটু জলপর্য্যন্ত নেই, পিপাসায় প্রাণ ফেটে যাচ্চে। তোমার কলসীতে কি জল আছে? একটু দেবে কি?"

রাধারাণী সেই মুহূর্ত্তে কলসী নামাইল। সে জল গড়াইল, ভক্তি ভরে স্বামীর হাতে দিল। এবার তাহার বক্ষ বিন্দুমাত্র কাঁপিল না, তাহার কোনও বাধা ঠেকিল না—সকল ব্যবধান মুহূর্ত্তে টুটিয়া গেল। রাধারাণী এই ক্ষুদ্র চালাখানির ভিতর স্বর্গের মত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিল। স্বামীর সেবা করায় সে কোনও প্রকার অন্যায় বা অপরাধ দেখিল না।

বদন বলিল, "রাধারাণী, তুমি বাড়ী যাও, এখানে থাক্‌লে তোমার জাত যাবে।"

রাধারাণী কহিল, "তোমার কাছে থাক্‌লে আমার জাত কেউ নিতে পারবে না।" তারপর তাহার নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে পুনরায় বলিল, "আমাকে এখানে থাকিতে দাও।"

বদন নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

পরাভব।

সেদিন নলিনাক্ষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি থাকিলেও বাল্যবন্ধু শৈলেন্দ্রের নিমন্ত্রণ কোনও মতে ত্যাগ করিতে পারিল না। সন্ধ্যায় শৈলেন্দ্র আসিয়া নলিনাক্ষের বিছানাপত্র পাটরী বন্ধনকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিল। নলিনাক্ষের কবিতার খাতা-খানি গৃহের একটা নির্জ্জন কুলঙ্গীতে তৈলসিক্ত অবস্থায় নির্ব্বাসন-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। ইদানীং সেখানির প্রতি নলিনাক্ষের তেমন আকর্ষণ বড় ছিল না। খাতাখানি শৈলেন্দ্রের করুণায় কুলঙ্গী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নলিনাক্ষের পুস্তকরাশির সহিত পুনর্ম্মিলিত হইল। রাত্রি আটটার সময় শৈলেন্দ্র নলিনাক্ষকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

নলিনাক্ষ আগামী কল্য প্রভাতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নূতন চাকরীস্থান এলাহাবাদ রওয়ানা হইবে, সুতরাং শৈলেন্দ্রের বাড়ীর সকলের সহিত অদ্য সাক্ষাৎ না করিলে শীঘ্র ইতিমধ্যে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই।

শৈলেন্দ্রের মাতা করুণাময়ী পরিবেশন করিতেছিলেন, কন্যা মেঘমালা ফাই ফরমাশ খাটিতেছিল; নলিনাক্ষ, শৈলেন্দ্র ও তাহার পিতা গিরিশবাবু আহারে উপবেশন করিয়াছেন। হাসি, গল্প ও নানাবিধ কথোপকথন চলিতেছে; মেঘমালা সমস্ত জিনিষপত্র রান্নাঘর হইতে বহিয়া আনিয়া জননীর পরিবেশন কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। আলোক বন্যার মত ঐ বালিকাটির আগমন প্রতিবার যেন সমস্ত কক্ষটিকে এক অপূর্ব্ব

ছ

সোহাগ-উল্লাসে পরিপ্লুত করিয়া দিতেছিল। করুণাময়ী স্নেহ-মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিন, তুমি চাকরী নিলে, কিন্তু অনেকদূরে! এলাহাবাদ! সে কি এদেশে—!"

নলিনাক্ষ শৈলেন্দ্রের মাতাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিত। শৈলেন্দ্রের জননী অকপট অন্তরে তাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন! নলিনাক্ষ কলিকাতার একটা মেসে অবস্থান করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিলেও তাহার সকল অভাব অভিযোগ শৈলেন্দ্রের জননীর স্নেহে মোচন হইত। সুতরাং আজ বন্ধু-গৃহ হইতে বিদায় লওয়া যেন জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের মত বারম্বার তাহাকে ব্যথিত করিতে লাগিল। সব চেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় হইল শৈলেন্দ্রের ভগিনী মেঘমালার কবিতা ও গল্প শুনিবার অভাব। সে করুণ-কাতর নেত্রে অনেকবার নলিনাক্ষের প্রতি তাকাইল। অতদূরে চাকরী লওয়াকে মেঘমালা অকুণ্ঠিত ভাবে অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল।

মেঘমালা ধীরে ধীরে বলিল "তা নলিন-দা, তোমার বাপু অতদূরে চাকরী লওয়া কোন মতে উচিত হয় নাই।"

নলিনাক্ষ এতক্ষণ কোন উত্তর দেয় নাই, চুপ করিয়া ছিল; বাসায় বেশ উৎসাহের সহিত সে বিছানাপত্র বাঁধিয়াছিল। নূতন চাকরী ও দেশ দেখিবার আনন্দ একটা নেশার মত তাহাকে আকৃষ্ট ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ এই ভদ্রপরিবারে মাতার স্নেহ ও ভগিনীর ভালবাসা তাহার সে মাদকতা বারবার ভাঙ্গিয়া দিতেছিল; তাহার পা যেন নোঙ্গর ফেলা নৌকার মত নড়িতে চাহিল না। নলিনাক্ষ একবার মনে করিল, "না হয় অতদূরে গিয়া কাজ নাই। এত বড় সহর কলিকাতায় কি আর একটা কর্ম্ম জুটিবে না।" তার পরক্ষণেই মনে হইল, "কখনই

হ'তে পারে না। কর্ম্ম স্বীকার করিয়া অদ্য রওয়ানা হইতেছি এরূপ টেলিগ্রাফ করিবার পর না যাওয়ার মত দুর্ব্বলতা আর কি হইতে পারে?" নলিনাক্ষ বলিল "অলসের মত ব'সে থাকা অপেক্ষা দিনকতক চাকুরীর মজাটা দেখে আস্‌তে দোষ কি? না পোষায় ছেড়ে দিতে কতক্ষণ।"

শৈলেন্দ্র বলিল "একবার চাকুরীতে জুড়িলে আর তখন কবিতা লেখা মাথায় থাক্‌বে, সাহিত্য-সেবা তখন দাসত্বসেবায় পরিপূর্ণতা লাভ করবে।" "দাসত্ব করিলেই যে সাহিত্য সেবা হয় না সেটা কিছুতেই বলতে পারা যায় না। অনেকক্ষেত্রে বরং দেখা যায় দাসত্বের মধ্যে সাহিত্য অত্যন্ত অধিক বিকাশ লাভ করে। তাহার উপর নানাদেশের অভিজ্ঞতা অনেক নূতন জিনিষ আনিয়া দেয়।"

শৈলেন্দ্রই নলিনাক্ষের সাহিত্য গুরু। শৈলেন্দ্র কবিতাসুন্দরীর আরাধনা আরম্ভ করিয়া প্রথমেই অভিজ্ঞ জহুরীর ন্যায় দুর্ল্লভ মাণিক নলিনাক্ষকে শ্রোতৃরূপে নির্ব্বাচন করে। তারপর কবিতা সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তৃতিলাভ করিয়া নলিনাক্ষের রক্ত মজ্জায় প্রবেশলাভ করে। কলেজ হইতে আসিয়াই সে খাতাপত্র হাতে ছাদে আশ্রয় লইত ও আত্মহারা হইয়া কবিতা রচনায় নিমগ্ন হইত। শৈলেন্দ্র আসিয়া সেগুলি অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিত। "কেমন লাগ্‌ল?" জিজ্ঞাসা করিলে শৈলেন্দ্র তেমন আগ্রহের সহিত উত্তর না দিয়া বলিত "মন্দ কি। তবে শেষটা আর একটু ভাল হওয়া উচিত ছিল।" এই সময় শৈলেন্দ্রের দুই একটি কবিতা দুই একখানি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেগুলি অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় এত দিন যে নির্জ্জন অরণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া অকালে গন্ধ বিলাইয়া শুষ্ক ও ম্লান হইয়া যাইতেছিল, সেটা কেবলই রসজ্ঞ পাঠকের অভাবে,

তাহা সে বারংবার বলিল। নতুবা শৈলেন্দ্রের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, এ দুইটি কবিতা তাহাকে বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু নলিনাক্ষের কবিতাগুলি অন্তরে অন্তরে তাহার নিকট অসহ্য হইয়া পড়িল। মেঘমালা ও তাহার জননী যখন নলিনাক্ষের কবিতা শুনিয়া আনন্দ, উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তখন মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত শৈলেন্দ্রের কবিতাগুলি যেন কিছুই নয় এই ভাবটাই তাঁহাদের আনন্দোদ্ভাসিত দৃষ্টিতে ফুটিয়া শৈলেন্দ্রের আত্মগৌরব ও অহঙ্কারকে খর্ব্ব ও মলিন করিয়া দিত। সে প্রাণপণ চেষ্টা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া যখন নলিনের মত কবিতা রচনা করিতে সমর্থ হইল না, তখন বন্ধু-প্রীতির মধ্যে একটা বিচ্ছেদের ব্যবধান সে বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে লাগিল। বন্ধুকে মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু ভাবিল। একটা অনিশ্চিত জয়ের লালসা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহার অন্তরে রহিয়া রহিয়া জ্বলিতে থাকিল। বাহিরের আচরণটা এত অতিরিক্ত-মাত্রায় হইয়া পড়িল যে, তাহা তাজ-গাত্রের বহুমূল্য প্রস্তরের স্থানে কাচের অনুজ্জ্বলতাই প্রকাশ করিয়া দিল। নলিনাক্ষ যতই সে ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে প্রয়াস পাইত, ততই তাহা সর্ব্বদিক দিয়া ধরা পড়িতে আরম্ভ করিল।

নলিনাক্ষ কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গ অবগত ছিল না। তাহার সরল অন্তঃকরণে এরূপ কোন ভাব কোন দিন যে উকি মারিয়াছিল তাহাও বলিতে পারি না। নলিনাক্ষ কবিতা লিখিত, আগ্রহের সহিত শুনাইত, সকলে প্রশংসা করিতেন, উৎসাহ দিতেন, এমন কি কোনও কোনও দিন মেঘমালা বলিত "দাদা, সমীরণ কাগজে তোমার যে কবিতা প্রকাশিত হ'য়েছে, সেটা এর কাছে কিছুই নয়! কি বল বাবা? তোমার কি মত?" গিরিশ

বাবু বিখ্যাত সমালোচক না হইলেও কন্যার সহিত প্রায় এক মত হইয়া পড়িতেন। তাহাতে শৈলেন্দ্রের হৃদয়-সাগরে ক্রোধের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে থাকিত। সে কোন মত প্রকাশ না করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।

(২)

অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। নলিনাক্ষ এলাহাবাদে আসিয়াছে। এখানে আসিয়া প্রথমটা কিছুতেই মন স্থির হয় নাই। সে প্রতিদিন বন্ধুবর শৈলেন্দ্রকে পত্র লিখিত, এবং কাব্যালোচনা যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে কথাই পত্রের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। শৈলেন্দ্র ইহাতে মনে মনে বড়ই প্রীত হইত। দুর্দ্দিনের দিনে যেন কাঙ্গালের বিপুল সম্পত্তি লাভের মত শৈলেন্দ্র প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। হৃদয়ের অনেকটা গুরুভার যেন এই পত্রগুলি লঘু করিয়া আনিত! সে একবার দুইবার করিয়া পত্রগুলি পড়িত। মেঘমালা যখন জিজ্ঞাসা করিত "নলিন-দার চিঠি এসেচে বুঝি? তিনি কেমন আছেন?" শৈলেন্দ্র বিজয়ী বীরের মত মৃদু মধুর হাসিয়া উত্তর করিত "চাকুরী কর্‌লে যেমন থাকে তেমনি আছে। বলেছিলাম ত সেখানে সাহিত্য-চর্চ্চা কখনই হবে না।"

"কেন দাদা, কি হয়েছে?"

"কবিতারস ছাতুর দেশে,—একেবারে শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছে। একে ত নলিন ভাল কবিতা কোনও দিন লিখ্‌তে পারত না। যা বা একটু আধটু অভ্যাস হয়েছিল—সে কেবল আমার তাড়নায় বই ত নয়।" এইরূপ কথোপকথনে মেঘমালার মুখখানি বর্ষার মেঘের মত নিবিড় ও গম্ভীর হইয়া আসিত; সে তার দাদার গুপ্ত আক্রমণটা বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব যে না

করিত তাহা নয়, কবিতা রচনার অন্তরায় স্বরূপ সুদূর প্রবাসের অবস্থানকে মূলীভূত কারণ নির্দ্দেশ করিবার অবসরে শৈলেন্দ্রের ঈর্ষাপীড়িত হৃদয়টি সর্ব্বদিক হইতে তাহার অজ্ঞাতে ধরা দিত। সহানুভূতি আবরিত ইর্ষান্বিত কথাগুলিকে সে কোনও দিন কোনও মতেই আত্মীয়তার ভাবে দাঁড় করাইতে পারিল না। দুইটি বিপরীত ভাবকে এক সঙ্গে আয়ত্ত করিবার মত শক্তি বা সামর্থ্য শৈলেন্দ্রের ছিল না। সুতরাং সে পদে পদে আপনার ক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে সর্ব্বসমক্ষে জাহির করিত।

শৈলেন্দ্র নলিনাক্ষকে পত্র লিখিবার সময় প্রায় নবরচিত কবিতা-গুলি লিখিয়া পাঠাইত। সে গুলি যে কলিকাতার সম্পাদক-মণ্ডলী আগ্রহের সহিত তাঁহাদের পত্রিকায় মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কথাটাই পত্রে অনেকবার উল্লেখ থাকিত। আর একদিন লিখিল, সম্প্রতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি তাহার একটী কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। কোনও সাহিত্যিক বন্ধুর নিকট প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন "এই যুবকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।" শেষোক্ত কথাগুলি শৈলেন্দ্র বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া তাহার নীচে লাল কালির একটী লাইন টানিয়া দিল,—পাছে নলিনের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। তারপর নলিনাক্ষের পত্রের উত্তরের আশায় অধীর হইয়া দুইবেলা পিয়নের জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিত। মনে মনে হাসিত, আর ভাবিত এবার নলিনকে বড়ই আঘাত করা হইয়াছে। সে লজ্জায় বোধ হয় উত্তর দিতে পারিতেছে না। কিন্তু পরদিন যখন পত্র আসিত এবং তাহাতে নলিন, বন্ধুর যশগৌরবে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছে, প্রবাসের নব পরিচিত বন্ধুদিগকে সেই পত্রখানি প্রদর্শন করিয়া শৈলেন্দ্রের বন্ধুত্বকে বিশেষভাবে দাবী করিয়া—আপনাকে গৌরবান্বিত

প্রতিপন্ন করিয়াছে ; তখন শীতের দিনে বৃষ্টির মত সে পত্র শৈলেন্দ্রের নিকট অসহ্য হইয়া পড়িত ; মনে হইত সমস্ত দুনিয়াটাই যেন তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভাবে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

(৩)

শৈলেন্দ্র বন্ধুকে বারংবার আঘাত দিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া নিজেকেই পীড়িত করিত। তাহার অজ্ঞাতসারে মন যে তাহারই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে সেটা মোটেই সে ধরিতে পারিত না। বিশ্ব-সংসারের মধ্যে শৈলেন্দ্রের সকল কার্য্য, সকল চিন্তাই ক্রমে নলিনাক্ষকে কেন্দ্র করিয়া চলিতে সুরু করিল। যেখানে ত্রুটী, যেখানে অভাব, সেখানেই নলিনাক্ষ সে ত্রুটীর মূল কারণ, এমন সিদ্ধান্তও ধীরে ধীরে শৈলেন্দ্রের সকল যুক্তিকে ছাপাইয়া চলিল। শৈলেন্দ্র সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া—দিনরাত কবিতাসুন্দরীর উপাসনায় মনোনিবেশ করিল। পড়াশুনার দিকে লক্ষ্য রহিল না। কেবল মিলের সন্ধান, ছন্দের অন্বেষণ করিয়াই তাহার সময় কাটিতে লাগিল। নাকে-মুখে একমুঠা গুজিয়া কোনও মতে আহার সমাপন হইত। যাহাকে সম্মুখে পাইত, তাঁহাকে ধরিয়া বৈকুণ্ঠের-খাতা শুনাইতে কিছুমাত্র অবহেলা করিত না। সে শুধু শুনাইয়াই ক্ষান্ত হইত না, সঙ্গে সঙ্গে তুলনায় নলিনাক্ষের দুই একটী কবিতাও বিকৃতকণ্ঠে শিথিল-উচ্চারণে আবৃত্তি করিত। নিজেই সমালোচকের অবিসংবাদি আসনখানি অধিকার করিয়া শ্রোতার নিকট উৎসাহভরে নলিনাক্ষের কবিতার সহস্র দোষ ত্রুটী প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইত না। এত করিয়াও দ্বন্দ্ববিমুখ, কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বী, বন্ধুযশঃ-প্রার্থী নলিনাক্ষের উপর তাহার হিংসাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইত না।

এই সময় 'গৌরব' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরমোহন বাবু পশ্চিম

পরিভ্রমণে বাহির হন। বিধাতার যোগাযোগে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলে নলিনাক্ষের সহিত গৌরবাবুর পরিচয় ঘটে।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে আর অল্প বাকি—অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ-চ্ছটা পশ্চিমগগনে মিশাইয়া আসিতেছে; দূরে জাহ্নবীতীরে তরুশিরে আলোক আঁধারে দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে, নদীর কূলে তরুমূলে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে ক্ষীণ ব্যবধান-রেখাটি অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে;—কেবল কুল কুল শব্দ শ্রুত হইতেছে। পার্শ্বে গর্ব্বদৃপ্ত দুর্গ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। অদূরে দুই একজন সাধু সন্ন্যাসী শাস্ত্রালাপে নিরত।

গৌরবাবু বলিলেন, "আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার খুব সন্দেহ হয় যে আপনার লেখাটেখা আসে—।"

নলিনাক্ষ পানের ডিবা গৌরবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া উত্তর করিল "পান খান—আমাদের আবার লেখা, সে ছাইভস্ম।"

"নিজের মুখে নিজের লেখার কে কবে আর প্রশংসা ক'রে থাকে বলুন। ছাইচাপা আগুন, সে ভয়ানক। কেবল একটু বাতাসের অপেক্ষা বইত নয়। তারপর সেই আগুনেই কি না ক'তে পারে। আসুন আসুন, আপনার কবিতাগুলি শোনা যাক্"।

"কেন লজ্জা দিচ্ছেন। আপনারা সম্পাদক; ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন, সেগুলি আপনাদের শোনার যোগ্য নয়।"

"শোনবার যোগ্য বা অযোগ্য বিচার লেখকের নয়, শ্রোতার। আসুন, আসুন।"

নলিনাক্ষ অগত্যা খাতাখানা বাহির করিল। দুই একটী কবিতা শুনিয়া গৌরবাবু বলিলেন "বাঃ, চমৎকার—! সুন্দর! এগুলি আপনি

লুকিয়ে রেখে বঙ্গভাষাকে বঞ্চিত করছিলেন। ভাগ্যে পীড়াপীড়ি করলাম। আমরা সম্পাদক মানুষ, আঁচড় দেখেই চিনতে পারি কোনটা ভাল লেখা, আর কোনটা মন্দ, কষ্ট ক'রে সবটা পড়তে পর্যান্ত হয় না।—"

"কেন অনর্থক লজ্জা দিচ্চেন।"

"আপনি দেখ্‌চি আমাকে মোটেই appreciate—উপলব্ধি করতে পারেন নাই। শপথ ক'রে বলচি, কবিতাগুলি সুন্দর হ'য়েচে। বেশ গভীর ভাব, সরল লেখা। আমি এগুলির মায়া ত্যাগ করতে পারব না! জানেনই ত সম্পাদকগণ সর্ব্বভুক।"

নলিনাক্ষ বলিল, "দেখুন গৌরবাবু, আমার বন্ধু শৈলেন্দ্রবাবু খুব সুন্দর কবিতা লিখ্‌তে পারেন; বোধ হয় তাঁর লেখা মাসিক পত্রিকায় দেখে থাক্‌বেন। যদি ইচ্ছা করেন ত তাঁর কবিতা আনিয়ে দিতে পারি।"

"তাঁর লেখা দেখেচি। তিনি অনেকবার আমার নিকট এসেচেন। এখনও তাঁর অনেকগুলি লেখা আমার নিকট রয়েছে। সেগুলির এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

নলিনাক্ষ ইহাতে নিজে নিজে যেন অপ্রতিভ হইল। কবিতা লইয়া আর বেশী আলোচনা করিতে তাহার সাহস হইল না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নলিনাক্ষের কবিতা 'গৌরব' পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। তখন 'গৌরব' পত্রিকার সাহিত্যজগতে পসার প্রতিপত্তি খুব। অনেক সহযোগী পত্রিকা সমালোচনার স্থলে নলিনাক্ষের কবিতার প্রশংসা বাহির করিল। সেগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত শৈলেন্দ্রের দৃষ্টি এড়াইল না। শৈলেন্দ্রের হৃদয় অনিমিত্ত দুঃখে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। নলিন যে তাহার অনুমতি না লইয়া মাসিকপত্রে কবিতা পাঠাইয়াছে, সুতরাং এ আচরণে সে সব চেয়ে বেশী ক'রে তাহাকে

অপমান ক'রেছে, এ চিন্তা শৈলেন্দ্রের অন্তরে ভয়ানক অশান্তিবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল।

এই ঘটনার পর হইতে শৈলেন্দ্র ভাল করিয়া আহার করিতে পারে না; পড়াশুনার কথা দূরে থাক্, কাহারও সহিত আলাপ করিতে যেন মাথা কাটা যায়! যে কাগজে নলিনাক্ষের কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেখানি বাড়ী হইতে পথে ফেলিয়া দিল,—আশঙ্কা পাছে মেঘমালা দেখে। সে মাসের যে যে কাগজে নলিনাক্ষের কবিতার উত্তম সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই পাতাগুলি শৈলেন্দ্রের তীব্র শাসনে দেশান্তরিত হইল। সে মনে করিয়াছিল নলিনাক্ষ যখন কবিতা প্রকাশের কথা পত্রে লিখিবে, তখন সে তার একটা কঠিন উত্তর দিবে। কিন্তু নলিনাক্ষের পত্রের মধ্যে যখন কবিতার কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পাইল না, তখন সে উর্দ্ধফণ সর্পের মত নিরুপায় ভাবে মাথা নত করিল।

শৈলেন্দ্রের শরীর দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছে দেখিয়া শৈলেন্দ্রের পিতা একদিন তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে তোমার কোনও রূপ অসুখ করে, তুমি ধ'রতে পার না, বা অবহেলা কর। জানি ত তোমার স্বভাব, একটা গুরুতর ব্যাপার না হ'লে আর তুমি বড় সে দিক লক্ষ্য কর না।"

শৈলেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "অমন করিয়া থাকা কিছু নয়, কা'লই একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে দেখানো উচিত।

শৈলেন্দ্রের পিতা বলিলেন "না হয় দিন কতক তুমি নলিনাক্ষের নিকট যাও, এলাহাবাদের জল হাওয়া ভাল, দুদিনে সেরে যাবে।"

মেঘমালা বলিল, "দাদা, সেই ভাল—সেখানে তোমার খুব যত্ন হবে। নূতন দেশ দে'খবে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের উপর কিন্তু একটা খুব ভাল দেখে কবিতা লিখে আমাকে পাঠিও। নলিনদাদারও তোমাকে পেয়ে খুব কবিতালেখার চাড় পড়ে যাবে!"

তিনজনেই শৈলেন্দ্রের স্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, শৈলেন্দ্র বন্ধুর নিকট গমন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে, ও সেখানে যাইলে তাহার রোগের শীঘ্র উপশম হইবে।

কিন্তু তিনজনেই যে একসঙ্গে শৈলেন্দ্রের ক্ষতস্থানে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে না পারিলেও এ প্রস্তাব শৈলেন্দ্রকে যে বিশেষ ভাবে বেদনা প্রদান করিল, তাহা তাহার বিকৃত মুখশ্রী অবলোকন করিলেই বুঝিতে পারা যাইত।

শৈলেন্দ্র কৃত্রিম হাসি হাসিয়া উত্তর করিল—"সে ছাতুর দেশে আবার মানুষে যায়! আর আমার এমনই বা কি হ'য়েছে যে বিদেশ না গেলে অসুখ সারবে না।"—সে আর দাঁড়াইল না। সে তখনই গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। হৃদয়ের ভিতর নলিনাক্ষের কথা ও সকলের তাহাকে এলাহাবাদে পাঠাইবার আগ্রহ প্রকাশ করা যেন তীক্ষ্ণ বাণের মত বিঁধিতে লাগিল। সে পড়িবার ঘরে যাইয়া হতাশ অন্তরে শুইয়া পড়িল। 'গৌরব' পত্রিকার সম্পাদকের ফাঁসীর আদেশ প্রদান করিলেও যেন তাহার ক্রোধের উপশম হয় না।

(৪)

কিছুদিন পরে নলিনাক্ষ লিখিল সে দুই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিতেছে। কলিকাতায় দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া বাড়ী

যাইবে। এ সংবাদ শৈলেন্দ্রের বাড়ীতে মহা আনন্দে গৃহীত হইল। মেঘমালার খুব আহ্লাদ হইল। শৈলেন্দ্র আহার করিতে বসিলে, জননী ধীরে ধীরে বলিলেন "নলিন আস্‌ছে, দুই তিন দিন ভিন্ন থাক্‌ছে না, তার একটু খাওয়া-দাওয়ার ভাল করে জোগাড় কর্‌তে হবে। বাছা আজ প্রায় দু বৎসর বাড়ী আসে নাই। বেশ ছেলে—মা ব'লে এসে যখন দাঁড়ায়, তখন তোতে আর তাতে কিছুমাত্র ভিন্ন ব'লে আমার মনে হয় না।"

শৈলেন্দ্র কোনও কিছু উত্তর করিল না,—যেন কথাটা শুনিতে পায় নাই। জননী মনে করিলেন শৈল কি আর সে কথা ভাব্‌বে না? তাই তিনি আর কিছু বলিলেন না।

সন্ধ্যার সময় গিরিশবাবু আসিয়া বলিলেন, "গিন্নি, মেঘমালার জন্য একটী পাত্র স্থির করেছি—ছেলেটি দেখ্‌তে শুনতে মন্দ নয়—চল্লিশ টাকা মাহিনার চাকরি করে, ভবিষ্যতে উন্নতি হবার খুব আশা আছে।"

গিন্নী বলিলেন—"আর দেরী করা ভাল দেখায় না। মেয়ে ত বড় হ'য়ে উঠেছে, এই মাঘ মাসে বিয়ে যাতে হয় তা কর্‌তেই হবে। ছেলেটির বাড়ী কোথা?"

"আমতার কাছে। শুনলাম দেশে দুদশবিঘা জায়গাও নাকি বেশ আছে, অন্নবস্ত্রের কষ্ট হবে না।"

গিন্নী উত্তরে বলিলেন, "আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিনু, নলিনাক্ষের সহিত মেঘমালার বিয়ে দিলে হয় না?"

কর্ত্তা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া উৎসাহভরে উত্তর করিলেন "হয় না আর! উত্তম হয়—হরগৌরীমিলন হয়! দেখ দেখি,

এ কথাটা কিছুতেই আর মনে আসে নাই। বড্ড মনে ক'রে দিয়েছ গিন্নি! আজ এখনই নলিনাক্ষের পিতাকে পত্র লিখ্‌ব। নলিনও ছুটি নিয়ে বাড়ী আস্‌ছে; এই সুযোগে শুভকাজটা সেরে ফেল্‌তে হবে।" তিনি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

(৫)

কড়াইসুটি ক্ষেতের উপর তখন প্রভাতসূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। শিশিরসিক্ত কড়াইফুলগুলির গায়ে সোণার রং লাগিয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্য বিকসিত হইয়াছে; ক্ষেতের আশে-পাশে শালিখ পাখীগুলি উড়িয়া বেড়াইতেছে। কৃষকগণ দূরে দাড়াইয়া গরু বাছুরের ভীতি উৎপাদন করিতেছে। নলিনাক্ষের পিতা ভবেশবাবু ভোরের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলে তাঁহার সাধের কড়াইক্ষেত একবার করিয়া প্রতিদিন তত্ত্বাবধান করিয়া যান।

সেই দিন সকালে পল্লী-পিয়ন সেখান দিয়া যাইতেছিল; সে ভবেশবাবুর হাতে একখানি পত্র দিয়া ভীতি-জড়িত কণ্ঠে বলিল—"এখানি কা'ল দেওয়া উচিত ছিল—শরীরটা ভাল ছিল না, তাই আস্‌তে পারি নি"—বলিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

ভবেশবাবু খামখানি উন্মোচন করিতে করিতে বলিলেন "এরূপ দেরি ক'র না—জান ত নলিন বিদেশে র'য়েছে।"

"আজ্ঞে, তা আর জানি না—আর বল্‌তে হবে না" বলিয়া সে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

ভবেশ বাবু সেখানে দাড়াইয়া দাঁড়াইয়া গিরিশবাবুর পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। মনের ভিতর একটা আনন্দের প্রবাহ বহিয়া গেল, মুখের

শিরাগুলিতে তাহার লক্ষণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। গিরিশবাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ জানা ছিল সুতরাং আজ এই প্রীতিবন্ধনের প্রস্তাব বড়ই সুখ-বোধ হইল। তিনি সেই দিনই নলিনাক্ষের জননীর সহিত পরামর্শ করিয়া গিরিশবাবুকে তাঁহাদের সম্মতি জানাইয়া পত্র দিলেন।

(৬)

শৈলেন্দ্র যখন দেখিলেন যে নলিনাক্ষের সহিত মেঘমালার বিবাহ স্থির হইয়া গেল এবং পাকা দেখা পর্য্যন্ত যথারীতি সুসম্পন্ন হইল, তখন অস্ত্রহীন নিরাশ্রয় সৈনিকের মত একদিন বাড়ী হইতে সে অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। গিরিশবাবুও পুত্রের এ অন্যায় অভিমানের মূলে কোন ভিত্তি না দেখিয়া, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ভাবিলেন দুই দিন পরে সব চুকিয়া যাইবে, তখন নিজের মূর্খতার নিমিত্ত নিশ্চয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে ; সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য বা ফিরাইয়া আনিবার কারণ কোনও রূপ আগ্রহ দেখাইলেন না।

নলিনাক্ষ এ সব কিছুই জানিতেন না। যে দিন পাকা দেখা হয় সে দিন শৈলেন্দ্রকে না দেখিয়া তাহার না আসার কারণ অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন যে, তাহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দিন কতকের জন্য মধুপুর বেড়াইতে গিয়াছে। কথাটার মূলে যে সত্য ছিল না তাহা নয়, শৈলেন্দ্র এরূপ অভিলাষ করিয়াই সে সময় মধুপুর চলিয়া গিয়াছিল। পাছে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে পাকা দেখায় যোগ দিতে হয়।

শৈলেন্দ্র আজকাল একটী মেসের বাসায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মেসের রান্না খাওয়া তাহার কোনও দিন অভ্যাস ছিল না, বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু বাড়ীর অপেক্ষা তথাপি যেন সে কতকটা শান্তি পাইল। সে দিন

রাত সকল সম্পাদকের বাড়ী গিয়া নলিনাক্ষের প্রকাশিত কবিতা-গুলির অযাচিতভাবে অযথা নিন্দাবাদ করিয়া উৎসাহের পরিবর্ত্তে অবজ্ঞাই লাভ করিয়া মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল এই নির্ব্বোধ সম্পাদকগুলির কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই—ইহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। কিছুতেই সে যেন আপনার শান্তি বা তৃপ্তি খুঁজিয়া পাইল না—কিছুই যখন তাহার ভাল লাগিল না—মনে হইল সমস্ত জগত যেন তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া নলিনের সহিত সন্ধি করিয়াছে। ইহার কিছু দিন পরেই মেঘমালার বিবাহ,—গিরিশবাবু আসিয়া বলিলেন "শৈল, আজ বাড়ী যাস্; ও রকম ক'রে থাকা কি ভাল? লোকে কি বল্‌বে?"

শৈলেন্দ্র মাথা নীচু করিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

(৭)

তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফুলের গন্ধে গৃহটি ভুর ভুর করিতেছে। দূরে দুইটি আলোক-দানে বাতি জ্বলিতেছে—শয্যার আশে পাশে দুই তিনটি ছোট ছোট মেয়ে বাসর জাগিতে আসিয়া নিদ্রাভিভূত। মেঘমালা রক্তবর্ণ চেলীতে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া খুব সঙ্কুচিতভাবে শুইয়া রহিয়াছে। নলিনাক্ষের মুখে বেশ উল্লাসের চিহ্ন নাই, বরং যেন তাহাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল যেন শৈলেন্দ্রকে লইয়া একটা ব্যাপার চলিতেছে। সে এই আনন্দ-উৎসবে মোটেই আসিল না কেন? তবে কি তাহার এ বিবাহে মত ছিল না। নানারূপ চিন্তায় তাহার নিদ্রা আসিল না, কি করিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে ডাকিল "মেঘমালা?"

এ কি! নিস্তব্ধ কক্ষে নবপরিণীতা স্ত্রীকে কে কবে এমন নির্লজ্জ ভাবে ডাকিতে পারিয়াছে। মেঘমালা চমকিয়া উঠিল।

সে বস্ত্রের মধ্যে এরূপভাবে অঙ্গসঞ্চালন করিল, যাহাতে নলিনাক্ষ বুঝিতে পারিল সেও বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতেছে।

সে আবার ডাকিল, "মেঘমালা, তুমি এখনও ঘুমাও নাই?" "না" মেঘমালা আজ নূতন করিয়া নলিনাক্ষর নিকট নববধূর লজ্জা আনিতে পারিল না।

"এ বিবাহে তোমার দাদাকে দেখিলাম না কেন—এ বিবাহে কি তাঁর অমত?"

মেঘমালা নলিনাক্ষের নিকট আগাগোড়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। নলিনাক্ষ কোনও কথা বলিল না দেখিয়া মেঘমালা বলিল, "তুমি কি দাদার উপর রাগ করলে?"

"না মেঘমালা, কেন রাগ করিব!"

রণান্তে অবসন্ন যোদ্ধার মত চতুর্দ্দিকে আত্মীয়জন সারারাত্রি পরিশ্রমের পর যে যেখানে পাইয়াছে বিনা শয্যায়, কেহ বা হাতের উপর মাথা রাখিয়া কেহ বা বিনা উপাধানে নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব গগন তখন রক্তিম ঘটায় ধীরে ধীরে রাঙ্গা হইতেছে; বাহিরে রুশনচৌকিওয়ালা মাঝে মাঝে তাহার বাঁশীতে করুণ ভাবে বিভাষ রাগিণী আলাপ করিতেছে।

প্রভাতেই বাসর ত্যাগ করিয়া নলিনাক্ষ শৈলেন্দ্রের মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। জামার পকেটে তাহার কবিতার খাতাখানি লইয়া গেল। সেখানি যে দিন সে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা আসে সে, দিন শৈলেন্দ্রকে দিবার জন্য মেঘমালার নিকট রাখিয়া গিয়াছিল। শৈলেন্দ্র নলিনাক্ষকে সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিল—কোনও রূপ অভ্যর্থনা বা সম্ভাষণ

করিতে পারিল না। নলিনাক্ষ আজ তাহাকে দুই বৎসর পরে দেখিল। তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া নলিনাক্ষের চক্ষু অশ্রুসমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। নলিনাক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুভাবে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "শৈলেন, এ কি করেচ ভাই? নিজেকে মেরে ফেল্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েছ? তোমার যে শরীর একবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—আমাকে ক্ষমা কর ভাই, ক্ষমা কর। প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি এ জীবনে আর কখনও কবিতা লিখ্‌ব না। এই দেখ তোমার সামনে কবিতার খাতা ছিঁড়ে ফেল্‌ছি" বলিয়া সে পকেট হইতে খাতাখানি বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে শৈলেন্দ্র তাহাকে আগ্রহভরে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিল, "ভাই, এতদিনে বুঝিলাম তুমিই কবি। আমাকে ক্ষমা কর, ঘৃণা করিও না, আমার বক্ষের ভার নামাইয়া দাও। আজ তোমার মত বন্ধুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম—তুমি যে মেঘমালাকে গ্রহণ করিয়াছ তাহাই আমার মুক্তির কারণ।"

নলিনাক্ষ কোন কথা না বলিয়া আগ্রহভরে শৈলেন্দ্রকে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিল।

দেনাশোধ।

১

কাঞ্চনপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে যে বৎসর রামহরি একটী নাবালক পুত্র, একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা ও কিঞ্চিৎ দেনা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন, সেই বৎসর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়চন্দ্রও কলিকাতা হইতে গৌহাটীতে কার্য্যোপলক্ষে বদলী হয়।

অসময়ে সহসা ভ্রাতৃবিয়োগে বিনয়চন্দ্র অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। সংসারে বৌঠাকুরুণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যা এবং স্ত্রী শৈলবালা ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

তাহাদের অভিভাবকবিহীন অবস্থায় রাখিয়া যাইতে বিনয়ের মন সরিল না; কিন্তু সে অন্য কোন উপায়ও নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। নূতন চাকুরী। তাহার উপার্জ্জনের উপর এতগুলি প্রাণীর জীবন নির্ভর করিতেছে, সুতরাং চাকুরী ত্যাগ করিলে সংসার অচল হইবে। এতদিন দাদা ছিল, অভাব অভিযোগ, সংসার চলা না চলা—সবই দাদা জানিত। সংসারের ভার এতদিন দাদাই বহিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং সংসার পরিচালনের কোন জ্ঞান তাহার ছিল না। সে পর্ব্বতের আড়ালে থাকিয়া কেবল বৌ-দিদির স্নেহে, অভিমান আব্দার করিয়াছে মাত্র। বিনয় সংসার-উদ্যানে প্রস্ফুটিত কুসুমের মত কেবল বিকশিত হইয়া সৌন্দর্য্য ও সৌগন্ধ বিলাইয়াছে; ঝড়ের প্রবল আক্রমণে যে

একদিন ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পতিত হইতে পারে, তাহা উদ্যান-স্বামীর যত্নে, বিনয় কোন দিন স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই।

বিনয়চন্দ্রের অগ্রজ রামহরির কলিকাতায় কারবার ছিল। আজ দুই বৎসরাধিক কাল সে কারবার, কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সময় ভগবানের কৃপায় বিনয়ের চাকুরীর যোগাযোগ সংঘটিত হয়।

রামহরিবাবু কারবার করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছেন, এ সংস্কার গ্রামবাসিগণের মনে বদ্ধমূল ছিল। আজ দুই বৎসর যাবত রামহরিবাবুর ধর্ম্ম কর্ম্মে অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখা গিয়াছিল।

পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে দুই দশজন ব্রাহ্মণসন্তানের পায়ের ধূলা তাঁহার সনির্ব্বন্ধ-আগ্রহে বাড়ীতে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। দধি সংযোগে সন্দেশ গলাধঃকরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণভোজনের নানাবিধ মহত্ব ও গুণকীর্ত্তন করিত। কলিতে ব্রাহ্মণভোজনই একমাত্র ধর্ম্ম, ইহা ব্যতীত সংসারীর গত্যন্তর নাই, সে কথাও যে না বলিত তাহা নয়। সন্দেশের "ধামার" প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিত, "এ পাতে আর গোটা দুই দাও ত হে!" তখন রামহরিবাবু মনে মনে ভাবিতেন, তাঁহার পাপের অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্ত এখানেই সম্পন্ন হইয়া গেল; কিন্তু ইহার উপর যখন স্ফীতোদর ব্রাহ্মণেরা আত্মীয়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিত,—"এ সময় বিনয়ও দু'পয়সা ভগবানের ইচ্ছায় আনতে শিখেছে, তার উপর তোমার কারবারটা যদি থাকৃত, তবে আজ ভাবনা কিসের? দোল-দুর্গোৎসব যে তোমার বাড়ী হ'ত তার আর কোন সন্দেহ নাই! কি বল হে হারাণখুড়ো?"

হারাণখুড়া তখন একসঙ্গে দুইটি সন্দেশ বদনের মধ্যে পূরিয়া

সমাধিস্থ ; সুতরাং কথা বলিয়া সমর্থন করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, মাথা নাড়িয়া তিনি জড়িতস্বরে উত্তর দিলেন—"সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় ! বারমাসে তেরপার্ব্বণ ত সামান্য, সতেরপার্ব্বণ না হয়ে আর যায় ।" কিন্তু কারবারের কথা উঠিলে রামহরিবাবুর বড় ভাল লাগিত না। তিনি যেন কেমন অস্থির হইয়া পড়িতেন। বুকের মধ্যে সহসা একটা তীব্র জ্বালা ফুটিয়া উঠিত ; মুখের উপর একটা দারুণ দুর্ভাবনার ছায়া ঘনাইয়া আসিত। তিনি কোন উত্তর দিতেন না। লোকে মনে করিত, নষ্ট-ব্যবসার কষ্ট লোকটি এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মুখের ভাবে যেন কেমন একটা অশান্তির লক্ষণ সদাসর্ব্বদা দেখা যাইত। শেষাশেষি তিনি বড় চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কি যেন একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। তাঁহার কারবারের জন্য তত দুঃখ হইত না, যত তাঁহার অংশী আলির জন্য হইত। বেচারা বিনাদোষে জেলে গিয়াছে। তাহা সংশোধন করিবার সময় বা উপায় আর নাই। এই চিন্তাই তাঁহার অন্তরে গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিত। কি করিলে যে তিনি পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেন। একদিনের একটী ক্ষুদ্র অপরাধ যেন ইষ্টিম-রোলারের মত তাঁহার সদনুষ্ঠানগুলিকে চাপিয়া পিসিয়া ফেলিতেছিল। কোন দিক দিয়া তিনি যেন সেই একটী ক্ষুদ্রশত্রুকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। আলি তখন কারাগারে অবস্থান করিতেছিল। কারবার তুলিয়া দিবার সময় আলির প্রায় দুই হাজার টাকা পাওনা ছিল, সে টাকাগুলিও পরিশোধ করা হয় নাই। রামহরি মনে করিয়াছিলেন, আলি খালাস হইয়া আসিলে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া টাকা ফিরাইয়া দিবেন।

দরিদ্রের ছিন্ন বস্ত্রাবৃত লজ্জার মত রামহরিবাবুর মনে হইত তাঁহার সেই সকলের অজ্ঞাত অপরাধটি সর্ব্বদিক দিয়া সভার মাঝে পড়িতেছিল।

(২)

"তা ঠাকুরপো, আমাদের আগ্‌লে ঘরে ব'সে থাক্‌লে ত সংসার চল্‌বে না। তোমাকে যখন বদলী করে দিয়েছে, তখন ভাই সেখানে যেতেই হ'বে" বলিয়া রামহরির স্ত্রী রাজলক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া অবাধ অশ্রুর গতিরোধ করিলেন। বিনয়চন্দ্র আজ কয়দিন ধরিয়া তাহার বুদ্ধিমতী বৌঠাকুরুণের সহিত এই কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। অবশেষে বৌঠাকুরুণের রায় বাহাল রহিল। বিছানা-পত্র, থালা, গেলাস বাটী ইত্যাদি গোছান হইল। পরদিন গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, বৌদিদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ছল ছল নয়নে বিনয়চন্দ্র প্রবাস-যাত্রা করিলে বৌঠাকুরুণ পল্লীর অনেকটা পথ পর্য্যন্ত দেবরের সঙ্গে আসিলেন। শেষে বহু কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো, সাবধানে থেকো, যদি কষ্ট হয়, তবে চ'লে এস। আমার গায়ের দু'খানা যা আছে, তাই দিয়ে এক মুঠো জুঠ্‌বে।"

বিনয়চন্দ্র কোন উত্তর দিল না। কেবল ভক্তিপরিপূর্ণ-নেত্রে বৌ-ঠাকুরুণের মুখের দিকে তাকাইল।

(৩)

বিনয়চন্দ্র কর্ম্মস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দুই চার জন বাঙ্গালীতে মিলিয়া একটী বাড়ী ভাড়া লইয়াছে। বিনয় বিদেশ ভাবিয়া যতটা আশঙ্কিত হইয়াছিল, এখানে আসিয়া ততটা ভাবিবার কারণ কিছুই দেখিল না! দিনের পর দিন বেশ এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল। সাহেবও তাহার কাজ কর্ম্মে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। বিনয়চন্দ্র যে বাড়ীতে

থাকিত, সে বাড়ীটী মন্দ নয়। তবে তাহার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত জঙ্গল। একদিন সে সব জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে, এই প্রস্তাব অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট উপস্থিত করিলে, তাঁহারা আগ্রহভরে তাহা অনুমোদন করিলেন। পরদিন আফিসে গিয়া স্থানীয় একজন কর্ম্মচারীকে দুই একজন কুলি সংগ্রহ করিয়া দিবার অনুরোধ করিলে, কর্ম্মচারী বলিলেন "লোকের অভাব কি? জেলারের নিকট যে কয়জন লোকের প্রয়োজন, একখানি পত্রে লিখিয়া পাঠান, এখনই তিনি বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন!"

বিনয় বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তিনি লোক কোথায় পাইবেন?"

"এখানকার কয়েদীদের এইরূপ কাজের জন্য দেওয়া হয়। তাহাদের মজুরী হিসাবে দুই আনা করিয়া জমা দিতে হয়।"

"তাই নাকি? খুব সুবিধা ত—আমি কা'লই লিখিয়া পাঠাইব!"

যথানিয়মে দুইজন কয়েদী জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আসিল। তাহাদের সহিত একজন ওয়ার্ডারও পাহারায় আসিল।

যখন তাহারা দুই একদিন জঙ্গল কাটিয়াছে, সেই সময় একদিন বিনয়ের শরীর অসুস্থ হইল। সেদিন সে আফিসে না গিয়া বাসায় রহিল।

দুপুরবেলা হাতে কোন কাজকর্ম্ম নাই। সেদিন তাহার কিছু ভাল লাগিতেছিল না। সে পুরাতন বঙ্গদর্শন পড়িবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। অদূরে গগনস্পর্শী শৈলমালা পরিদৃষ্ট হইতেছে। রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত বাতাস বিরহীর কাতর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত মাঝে মাঝে বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অধীর করিতেছে। কোথাও শ্যামল তরুচ্ছায়ায় গাভিগণ রোমন্থন করিতেছে। এই নীরব নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, বিনয়চন্দ্রের মনে নানা চিন্তার উদয় হইতেছিল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় স্নেহ-

প্রবণ বৌদিদির সেই করুণ অনুরোধ, "ঠাকুরপো যদি কষ্ট হয়, তবে চ'লে এস ; আমার গায়ে হু'খানা যা আছে, তাই দিয়ে একমুঠো জুঠ্‌বে" মনে পড়িতে লাগিল।

তারপর ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যার জন্য তাহার মন উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইল। সে তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ট্রাঙ্কটি খুলিয়া বাড়ীর পুরাতন পত্রগুলি বাহির করিল। একবার দুইবার তিনবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার বড় শীত করিতে লাগিল। ট্রাঙ্কে একটা গরম কাপড়ের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, তাহার দাদার গরম কোটটি বউদিদি তাহার বাক্সে পুরিয়া দিয়াছেন। বিনয়ের চক্ষে জল আসিল। অনেকক্ষণ জামাটি লইয়া সে নাড়াচাড়া করিল। তারপর সেটী গায়ে দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

সেই মূকপত্রগুলি সহসা যেন এক ইন্দ্রজালে মুখর হইয়া উঠিল। তাহাদের অভ্যন্তরে যেন অজস্র শান্তি ও আনন্দ ছিল ; কারণ সেগুলি পুনরায় পাঠ করিতে করিতে বিনয়চন্দ্রের বিষণ্ণ মুখ আনন্দ-আবেগে আরক্ত হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে বিশেষ যত্ন সহকারে পত্রগুলি ভাঁজের উপর ভাঁজ করিল। একখানির পর আর একখানি রাখিয়া, একটী লাল সূতার দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। অমূল্য দ্রব্যের ন্যায় সযত্নে সেগুলি ট্রাঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখিল। অন্য-মনস্কভাবে পকেটে হাত পড়িতেই একখানি কাগজ তাহার হাতে ঠেকিল। বিনয় তাড়াতাড়ি সেখানি কি, দেখিবার নিমিত্ত বাহির করিয়া দেখিল, দাদার লেখা একখানি পত্র।—পত্রখানি 'সুহৃদ্বরেষু' বলিয়া সম্বোধিত। "আলি, আমার ভুলে আজ তোমার এই বিড়ম্বনা। আমি অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছি। তুমি আমাকে বন্ধু ভাবিয়া ক্ষমা

করিবে। আমি কারবার বন্ধ করিয়া দিলাম, কারণ তোমার অবর্ত্ত-মানে লাভ লোকসানের গুরুভার বহন করিতে আমি অসমর্থ। তুমি জেলে, আর আমি ব্যবসা করিয়া লাভ লইব, এরূপ প্রবৃত্তি আমার নাই। জগদীশ্বর তোমায় সুস্থ শরীরে ফিরাইয়া আনুন! তোমার দুইহাজার টাকা তোমার হাতে দিয়া আমি ঋণমুক্ত হই।”

বিনয়চন্দ্রের ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ নির্গত হইল। তাহার নয়ন-সমক্ষে একখানি অজ্ঞাত নাটকের পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নানা রূপ চিন্তা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে যেন আজ তাহার জীবনের অনেকগুলি অসংযুক্ত মীমাংসাকে যুক্ত করিতে পারিল। এই সময় সহসা একটা কাক প্রাচীরের উপর হইতে “কা কা” রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টি তখন সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল একজন কয়েদী বিস্ময়বিহ্বলনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার হাতের কোদাল হাতেই আছে। সে যেন বিনয়ের মুখে কোন এক অতীতের তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে—যেন বহু সন্দেহকে পরাজয় করিয়া অভ্রান্ত সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। বিনয়ের চক্ষু যখন তাহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইল, তখন কয়েদী এতই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে সহজে নয়ন ফিরাইতে পারিল না।

বিনয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিল; সে প্রথমটা একটু শঙ্কিত হইল, ভাবিল বুঝি দাঁড়াইয়া থাকার নিমিত্ত বাবু তিরস্কার করিবেন। পরে সে ধীরে ধীরে বিনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইল। বিনয় আস্তে আস্তে মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছিলে ?”

কয়েদী কোন উত্তর করিতে পারিল না; কারণ তখন তাহার মুখে

একটা শঙ্কার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। তাহার মনে হইল যেন এরূপ চাহিয়া দেখিয়া সে একটা গুরুতর অন্যায় করিয়াছে, তাহা আবার তাহারই সতর্কতার অভাবে ধরা পড়িয়াছে। এখন কি বলিয়া বাবুর কথার উত্তর দিবে, সে তাহা ভাবিয়া আকুল হইল।

লোকটা কয়েদী হইলেও তাহার হৃদয়ের অকলঙ্ক প্রসন্নতা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পাপ করিয়া জেল খাটিলে কয়েদীর মুখমণ্ডলে যেরূপ কলঙ্ক ও মলিনতার ছাপ পড়ে, এ লোকটীর মুখে সে প্রকার কোন চিহ্ন ছিল না। বিনয় দেখিল, লোকটী বেশ শান্তপ্রকৃতির; সে বলিল,—"তোমার কোন ভয় নাই, সত্য কথা বল। তুমি যেন আমায় কিছু বলবে এমনভাবে চেয়েছিলে, নয়?"

"আজ্ঞা, আমি একঘণ্টা বেশী খেটে দেব।"

"না না, আমি সে কথা কিছু মনে করিনি। তুমি কি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবে মনে ক'রে চেয়েছিলে?"

কয়েদী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর কম্পিতস্বরে উত্তর করিল,—"আপনার মুখে যেন ঠিক তাঁর মুখের আদল আসে" বলিয়া বেচারী একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সম্মুখের বারান্দায় একটা শালিখ পাখী বসিয়া ঠোঁট দিয়া গা খুঁটিতেছিল, সে সেই শব্দে উড়িয়া গেল। এই অবকাশে বিনয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কয়েদীর মুখের উপর পড়িলে, কয়েদী তাড়াতাড়ি হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল।

বিনয় ভাবিল, ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কোন গূঢ়রহস্য আছে। সে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"হাঁ, কার মত আদল আসে বলছিলে?"

"আজ্ঞে, আপনি কি তাঁকে চেনেন?"

"না চিনতে পারি, কিন্তু সে কি তোমার আপনার লোক।"

"আজ্ঞে, সে অনেক কথা।"

এই সময় ওয়ার্ডার আসিয়া কয়েদীকে অযথা গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

বিনয় ওয়ার্ডারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ, আমি উহার মজুরী দিব, আমার কাজ হোক আর না হোক্ আমি বুঝ্‌ব, তুমি ওকে অমন ক'রে গালি দিও না।"

সে বলিল, "মশায়, আপনি জানেন না, ও আজ প্রায় দু ঘণ্টা ফাঁকি দিয়েছে। হাঁ ক'রে, এই ঘরের দিকে চেয়ে ছিল ; চুরির লোভটা এখনও যায় নাই।"

কয়েদী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ওয়ার্ডারের প্রতি একবার তাকাইল, তারপর অতি ধীরে ধীরে বলিল, "কাজ না করার জন্য, তুমি যত পার গালি দাও, দুঃখ নাই, কিন্তু চোর বলিও না। এটা মনে রেখ, সব মানুষই অপরাধ ক'রে দণ্ড পায় না। সবই অদৃষ্টের ফের। আমি জীবনে কখনও চুরি করি নাই।"

জেল খাট্‌তে খাট্‌তে আজ তিন বছর কাট্‌ল, উনি হ'লেন সাধু বাবাজি" বলিয়া ওয়ার্ডার মুখ বিকৃত করিল।

বিনয় কয়েদীর কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে তাহার মনে কয়েদী সম্বন্ধে একটা ভাল ধারণা জন্মিয়াছিল। তাহার কথাবার্ত্তায় সেটা আরও বদ্ধমূল হইল। তারপর তাহার এই সংযত সাধুভাষা শ্রবণ করিয়া, বিনয়চন্দ্রের সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বিনয়চন্দ্র বলিল,—"আজ তোমার ছুটির সময় হইয়াছে, এখন তুমি যাও, কা'ল আসিও।" তারপর ওয়ার্ডারকে দুই আনা পয়সা

বক্‌শিস দিয়া বিনয়চন্দ্র বলিল,—"লোকটাকে কিছু বলো না। কাল খুব খাটিয়ে নেওয়া যাবে।" সে একগাল হাসিয়া বলিল, "সেই বেশ বাবু!"

৪

পরদিন বিনয় ইচ্ছা করিয়া আপিসে বাহির হইল না। তাহার মনে এই হতভাগ্য কয়েদীর কাহিনী শুনিবার জন্য প্রবল আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে কয়েদী কাজ করিতে আসিল। সেদিন তার মুখ দেখিয়া বিনয়চন্দ্র মনে করিল যেন সে সারারাত্রি ঘুমায় নাই। একদিনের মধ্যেই যেন তাহার চেহারার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিনয়চন্দ্র কয়েদীর কথা শুনিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। সে আসিতেই তাহাকে নিজের কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল ও একখানি কেদারায় উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। কয়েদী সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"আজ্ঞে থাক, আমি মেঝেতে বস্‌চি।"

"না, না, তুমি কেন বৃথা সঙ্কোচ কর্‌চ, কেদারায় বস্‌তে কোন দোষ নাই" বলিয়া বিনয়চন্দ্র আগ্রহভরে তাহার হস্তধারণ করিয়া টানিয়া কেদারায় বসাইয়া দিল। সে নির্ব্বাক হইয়া বিনয়ের মুখের দিকে অচঞ্চলনয়নে তাকাইয়া রহিল।

কক্ষটি দুই মিনিটের জন্য নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। উভয়ে কেহই কোন কথা কহিল না। ঘরের কোণে টিপয়ের উপর টাইমপিস্‌টি কোন কথায় কাণ দিল না। সে টক্ টক্ করিয়া ক্রমান্বয়ে চলিতেছিল। এই সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিনয়চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম আলি অসয়?" কয়েদী সে কথায় কর্ণপাত

করিল না। সহসা গৃহভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত একখানি ফটোগ্রাফের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইলে সে চমকিয়া উঠিল। সে একবার চিত্রের দিকে, একবার বিনয়চন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে ঘোরতর সন্দেহ ঘনাইয়া আসিল, তবে কি ইনিই তিনি। অনেক কথা স্মরণ হইল; সে তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া ছবির নিকট গিয়া দাঁড়াইল। পরে দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া "শোভন আল্লা" বলিয়া ঘরের মেঝের উপর পাগলের মত বসিয়া পড়িল।

বিনয়চন্দ্র ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিল না; ধীরে ধীরে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। বলিল "কি হ'ল তোমার?" সে কোন উত্তর দিল না। তখন তাহার দুই নয়ন অশ্রুপ্লাবিত; বক্ষঃস্থল ঘন ঘন স্পন্দিত। মুখ ফ্যাকাশে হইয়া মৃতের মুখের মত দেখাইতেছিল।

সে ভাল করিয়া বিনয়ের মুখের দিকে আর একবার চাহিল। অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া কেবলই গৃহভিত্তিগাত্র-বিলম্বিত চিত্রের সহিত বিনয়ের মুখ মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর বলিল,—"ইনি ঠিক রামহরিবাবুর মত—ইনি কি আপনার কেউ হ'ন?" বিনয়চন্দ্র বলিল, "তুমি কি রামহরিবাবুকে চিনতে?"

কয়েদী উৎসাহভরে উত্তর করিল, "শুধু চিনিতাম কি বলুন! রামহরিবাবুর সহিত আমার কলিকাতায় ব্যবসা ছিল। রামহরিবাবু আমার বাল্য বন্ধু" বলিতে গিয়া সহসা নয়ন অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে খানিকক্ষণ কথা বলিতে পারিল না। কেবল একদৃষ্টে সেই ফটোখানির দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি যেন নির্জ্জীব চিত্রের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া দেখিতেছিল। তারপর বলিল, "রামহরিবাবুর মত

ভাল লোক কখন দেখিনি। আমি মুসলমান, তিনি হিন্দু ; কিন্তু আমরা যেন দুই ভাই ছিলাম।” বিনয়চন্দ্র স্থিরভাবে তাহার মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শুনিল। পরে বলিল “অপরাধ লইবেন না, আপনার এরূপ অবস্থান্তর হইবার কারণ কি, জানিতে পারি ?” কয়েদীর যেন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার কথাগুলি বড়ই বেদনাকাতর। সে বলিল,—“তিনি কারবার দেখ্‌তেন : তাঁহার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল ; এখনও আছে ; কিন্তু হায় সকলই অদৃষ্টের ফের। একদিন একজন মহাজনের সহিত হিসাবের গোল হইল। টাকাকড়ি সব আমিই মহাজনদের বাড়ী গিয়া দিয়া আসিতাম। সেবার মহাজন অনেক টাকা পাওনা দেখাইলে রামহরিবাবু বলিলেন,—“অত টাকা দেনা আমাদের নাই।” তিনি খাতায় খরচ দেখাইলেন।

বিনয়চন্দ্র আসামের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া মানসপটে সুদূর বঙ্গদেশের কোন এক শ্যামল পল্লীগ্রামের একখানি গৃহের সুন্দর চিত্র অবলোকন করিতেছিল—যেখানে তাহার দাদা রামহরি কলিকাতা হইতে আসিয়া বসিতেন, তাহাকে নানাবিধ দ্রব্য জামা কাপড় দিয়া ভ্রাতৃস্নেহে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেন, যেখানে বসিয়া তাহাদের মুখের হাসি দেখিয়া প্রবাসের বিপুল পরিশ্রম, অজস্র কষ্ট উপেক্ষা করিতেন, আর বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতেন “বড়বৌ, বিনয় বড় হ’লে, লেখাপড়া শিখ্‌লে আর আমাকে বিদেশে থাকৃতে হ’বে না।” আজ দাদার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইল, সে মনে মনে বলিল “আমি দাদার কিছুই ত করিতে পারিলাম না।” তারপর সে কয়েদীকে সহসা জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনি মহাজনদের যে টাকা দিয়া আস্‌তেন, তাহার একটা জমাখরচ রাখ্‌তেন না ?”

"আজ্ঞে না, রামহরিবাবু খাতায় খরচ লিখিতেন। আমাকে যখন যেমন দিতেন, তেমনই দিয়া আসিতাম।"

"তা হ'লে কতটাকা কার পাওনা বা কতটাকা দেনা, সে বিষয় আপনি কিছুই জানতেন না?"

"না, জানবার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না, কারণ রামহরিবাবু খুব হিসাবীলোক।"

"তাহা হইলে সেই হিসাব নিয়ে মহাজনের সঙ্গে খুব মনান্তর হয়েছিল।"

"সেই কথাই বলছি। তিনি আমাদের নামে নালিশ করলেন। মকদ্দমায় প্রমাণ হ'য়ে গেল, টাকাটা আমি জমা দিই নাই, আত্মসাৎ করেছি। সে অনেক কথা। নিশ্চয় আমি পূর্ব্বজন্মে এমন পাপ করেছিনু যে, তার ফলে আমার দুই বৎসর কারাদণ্ড হ'য়ে গেল।"

বিনয়চন্দ্র এতক্ষণ পলকবিহীননেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। কথা শেষ হইলে সে একটী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না, তারপর বলিল,—"আপনার বোধ হয় খালাসের দিন নিকট হ'য়ে এসেছে।"

"আর পনরু দিন মাত্র বাকী আছে।"

"আপনি কি বরাবর দেশে যাবেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আপনাদের গ্রাম কোথায়? সেখানে ইস্কুল আছে কি?"

"আমাদের গ্রামের নাম নবীনপুর। ইস্কুল, পোষ্টঅপিস সব আছে।"

বিনয়চন্দ্র এইরূপে অন্যকথা পাড়িয়া বলিল,—"আপনার সহিত আলাপ

হওয়ার অত্যন্ত সুখী হলাম। আমিও মনে করছি দিন কতকের জন্য একবার বাড়ী যাব, কা'লই যাব।"

আলি জিজ্ঞাসা করিল, "রামহরিবাবু কি আপনার কেহ হন? অমন ভদ্রলোক আমি দেখিনি।"

বিনয়চন্দ্র খুব সঙ্কোচের সহিত উত্তর করিল,—"তিনি আমার নিকট আত্মীয়।"

"তাই নাকি? তিনি বোধ হয় ভাল আছেন।"

ছলছল চক্ষে বিনয় বলিল,—"সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন।"

"বলেন কি? মারা গিয়াছেন" বলিতে বলিতে কয়েদীর আঁখি-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, সে কোন কথার উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। যাইতে যাইতে বলিল, "আজ আসি।"

(৫)

ইহার কিছুদিন পরে বিনয়চন্দ্র ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড়বৌ বলিলেন,—"না ঠাকুরপো, তুমি আমার কথা শোন। আমার অলঙ্কারের কোন আবশ্যক নেই, এ গহনাগুলি বিক্রয় করলে কোন ক্ষতি হবে না। আমার অলঙ্কারে আর প্রয়োজন কি?"

বিনয়চন্দ্র বলিল,—"আমি মনে করেছিলাম কোন রকম ক'রে দু হাজার টাকা জোগাড় ক'রতে পারব, কিন্তু তা দেখ্‌ছি শুধু ছোটবৌয়ের অলঙ্কার বিক্রয় ক'রে হবে না"—এই সময় রাজলক্ষ্মী পার্শ্বের ঘরে উঠিয়া গিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা ক্যাস্‌বাক্স হাতে ফিরিয়া আসিলেন। অঞ্চল হইতে চাবির রিংটি খুলিলেন, তারপর রিং হইতে একটা চাবি মুক্ত করিয়া দেবরের হাতে দিলেন; বলিলেন—"ঠাকুরপো! আমার একটা অনুরোধ

রক্ষা কর—তুমি এগুলি নাও। তাঁহার টাকা তাঁহার কাজে লাগুক।” এই সময় ছোটবৌ তাঁহার সকল অলঙ্কার অঙ্গ হইতে মোচন করিয়া রাজলক্ষ্মীর নিকট রাখিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—“ঠাকুরপো, আমার বিশ্বাস এই বাক্সের অলঙ্কারের মূল্য চার হাজার টাকার কম হবে না।” তারপর রাজলক্ষ্মী শৈলবালার আভরণগুলি নিজে তাহাকে পরাইয়া দিলেন। শৈলবালা চিত্রার্পিতের মত বিস্ময়মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এই ব্যাপারের দুই চারিদিন পরে বিনয়চন্দ্র পোষ্টআপিসে গিয়া আলির নামে দুই হাজার টাকা মনিঅর্ডার করিল। বাড়ী আসিয়া বলিল—“বৌদিদি, আজ তুমিই দাদার দেনাশোধ ক’রলে, আমি পা’রলাম না।”